৪র্থ বর্ষ, ১ম সংখ্যা

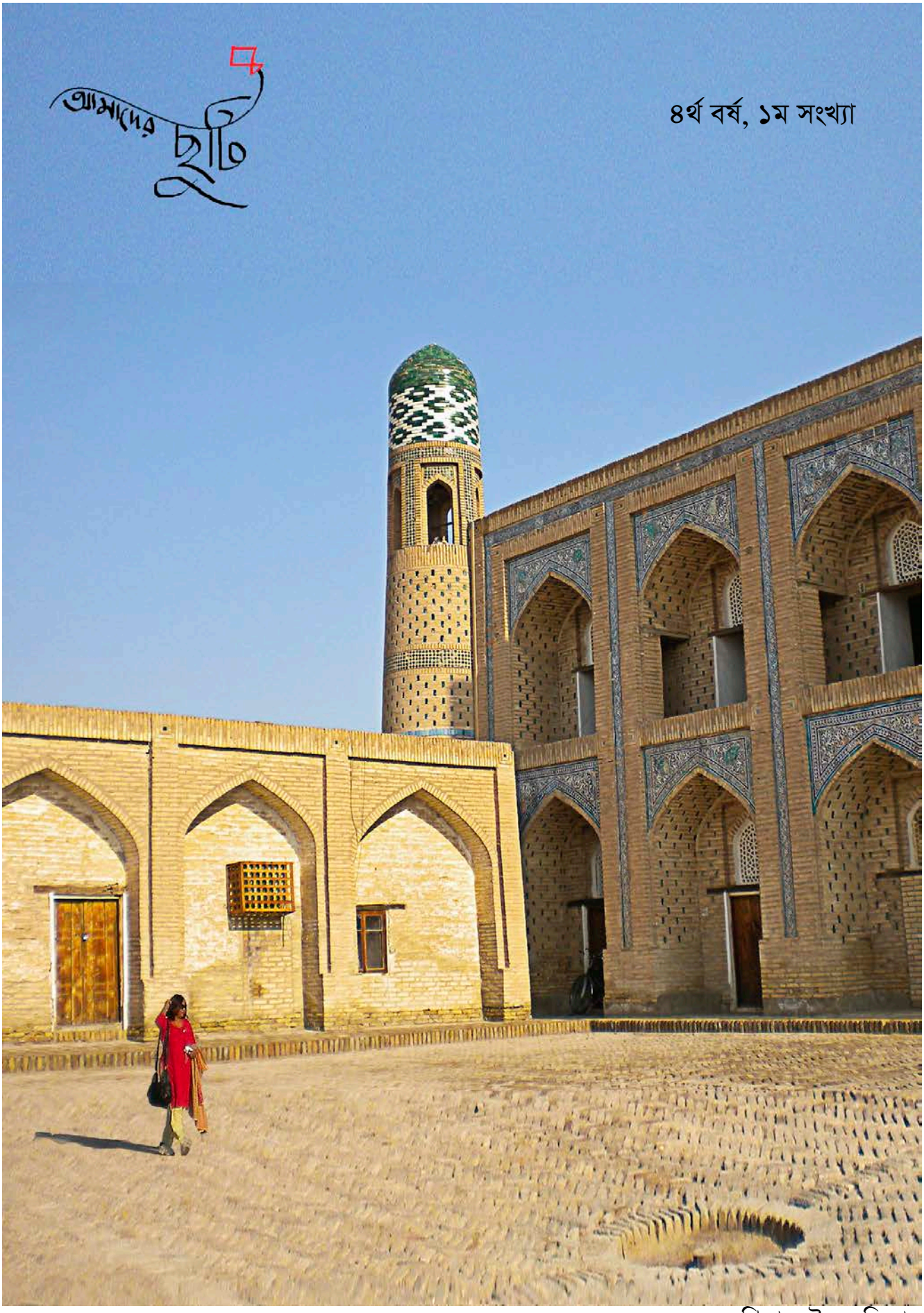

খিভা - উজবেকিস্তান

আলোকচিত্রী- শ্রীমতী মঞ্জুশ্রী সিকদার

☐ ৪র্থ বর্ষ ১ম সংখ্যা - বৈশাখ ১৪২১ ☐

"গরম লাগে ত তিব্বত গেলেই পার। ... সিধে রাস্তা, সওয়া ঘন্টার পথ।" - কলকাতায় বসে গরমে ঘামতে ঘামতে, রোদে ঝামা হতে হতে আর ফেসবুকে দার্জিলিং, গ্যাংটক, লাদাখের একের পর এক ছবি দেখতে দেখতে সুকুমার রায়ের কথাটাই মনে হচ্ছে কেবল। ইস্ যদি অমনি যাওয়া যেত - কতই বা দূর - " কলকেতা, ডায়মণ্ড হার্বার, রাণাঘাট, তিব্বত - বাস্!" আহা, তাহলে দিব্যি মাঝে মাঝে ঠাণ্ডা হাওয়া খেয়ে আসতাম। নেহাত 'গেছোদাদা'র বর্তমান ঠিকানাটা জানা নেই। কী আর করা যাবে - ফাল্গুনীদার লেখা পঞ্চাশ বছর আগেকার কাশ্মীরের কথা কিম্বা মার্জিয়ার লেখা কেদার আর কুফরি পাহাড়ের ভ্রমণ কাহিনি পড়েই মনটা ঠাণ্ডা করছিলাম। ওই যে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি। আর সেই ক্ষোভেই জ্ঞানের দীনতা পূরণ করতে তাই ভ্রমণ কাহিনি পড়ি। কথাটা ভীষণভাবে সত্যি। আন্তর্জালের দুনিয়ায় এখন পৃথিবীটা অনেক ছোট হয়ে গেছে, কিন্তু তাতে ভ্রমণ কাহিনি পড়ার তাগিদটা মানুষের একটুও কমেনি। বইয়ের পাশাপাশি বরং জুড়ে গেছে ই-বুক, বিভিন্ন ওয়েবসাইট কিম্বা ব্লগের পাতার লেখা। এবারের লেখাগুলো দেখতে দেখতে, সাজাতে সাজাতে, পড়তে পড়তে আমিও যেন পৌঁছে যাচ্ছিলাম মঞ্জুশ্রীদির সঙ্গে 'উজবেকিস্তান', জিয়াউল কিম্বা সুরাইয়ার সঙ্গে বাংলাদেশের অচেনা কোন কোণে, অদিতির সঙ্গে ছুঁয়ে আসছিলাম ভারতবর্ষের দক্ষিণের শেষ প্রান্তভূমি। তপনবাবু বহু চেনা দীঘারও অচেনা দিকটি দেখিয়ে দিলেন আমায়। কে বলে 'গেছোদাদার' ঠিকানা পাওয়া যায় না? 'আমাদের ছুটি'র কাজ করার এইটাই বোধহয় সার্থকতা, নইলে কতটুকুই বা যোগ্য আমি!

তবু যখন হিমালয়ের সামনে দাঁড়াই, সুনীল সমুদ্রের উচ্ছ্বাস হৃদয়ে অনুভব করি, গভীর অরণ্যের নিজস্ব গন্ধে ভরে নিই ফুসফুস, আন্দামানের সেলুলার জেল, অজন্তার গুহামন্দির, আগ্রায় তাজমহল দেখে বা জাতীয় গ্রন্থাগারে অতীতকে ছুঁয়ে শিহরিত হই, অমলাশঙ্করের মত আলোকময় ব্যক্তিত্বের মুখোমুখিতে মুগ্ধ হয়ে উঠি অথবা বইয়ের পাতা কিম্বা ই-বুক-এ খুঁজে পাই ভালোলাগার ভ্রমণ আখ্যান তখন এই পাওয়ার জন্য কৃতজ্ঞ লাগে নিজের। প্রতিদিনের জীবনের সুখ-দুঃখ, ভালোমন্দের সীমাবদ্ধতা পেরিয়ে আমারও বলতে ইচ্ছা করে - পৃথিবী কী আশ্চর্য সুন্দর আর আরও সুন্দর এই বেঁচে থাকাটা।

আসলে আমরা সকলেই কখনও না কখনও নিজের মত করে 'গেছোদাদা'র ঠিকানা ঠিক খুঁজে পেয়ে যাই...

চার-এ পা রাখল 'আমাদের ছুটি'। বাংলা ক্যালেন্ডারের নতুন বছরে সব বন্ধুদের জন্য আন্তরিক শুভকামনা।

- দময়ন্তী দাশগুপ্ত

এই সংখ্যায় -

"এই এক্সিবিশনে কতগুলো যে কলোনিয়াল দেশ যোগ দিয়েছিল - হল্যাণ্ড, আফ্রিকা, জাভা - কত মানুষের সঙ্গে, তাদের সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলাম। ইন্দোনেশিয়ার থেকে আঙ্কোরভাটের মন্দিরের আদলে ষ্টল করেছিল। মাপেও একরকম। আফ্রিকা থেকে উইয়ের ঢিপির মতো কুঁড়েঘর বানিয়েছিল। কয়েকটি আফ্রিকান পরিবার সেখানে ছিল-ও। তারা গাছের ডাল কেটে হাতা বানিয়ে রান্না করত। সেইসব দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতাম। ভারি ভালোলাগত।"

- এবার কথোপকথনে 'সাত সাগরের পারে' রচয়িত্রী নৃত্যশিল্পী অমলাশঙ্কর।

"একদিন রাস্তায় একটি মেথরকে জিজ্ঞাসা করলাম - চুল কাটাবো কোথায়? সে আমার মুখের দিকে চেয়েই বুঝল যে বিদেশী; তখন সে ঝাড়ু সেখানেই ফেলে রেখে আমাকে নিয়ে তিন চার মিনিটের পথ দূরে একটা হেয়ার-কাটার স্যালুনে উপস্থিত করে চুল কাটার বন্দোবস্ত করে দিয়ে আনন্দে হাসতে হাসতে বিদায় হল। মেথর কি আর মেথর!" ***-'বিলাত ভ্রমণ' অক্ষয়কুমার নন্দীর কলমে।***

☐ আরশিনগর ☐

নিরালা গ্রাম পানতুমাই - এ.এস.এম জিয়াউল হক

দিনান্তভ্রমণে দিঘা - তপন পাল

ঝরনার পাড়ে তাঁবুর ফানুস - সুরাইয়া বেগম

☐ সব পেয়েছির দেশ ☐

তিন সাগরের মিলনস্থল – কন্যাকুমারী - অদিতি ভট্টাচার্য্য

যেখানে আকাশ নাম ধরে ডাকে - মার্জিয়া লিপি

কাশ্মীর – পঞ্চাশ বছর আগে - ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়

☐ ভুবনডাঙা ☐

রেশম পথের যাত্রী - মঞ্জুশ্রী সিকদার

☐ শেষ পাতা ☐

বসন্ত উৎসবে শান্তিনিকেতনে - শুভ্রনীল দে

To view this site correctly, please click here to download the Bangla Font and copy it to your c:\windows\Fonts directory.

For any queries/complaints, please contact admin@amaderchhuti.com

© 2011 - AmaderChhuti.com • Web Design: Madhuwanti Basu

Best viewed in FF or IE at a resolution of 1024x768 or higher

কথোপকথন

১৯১৯ সালের ২৭ জুন অধুনা বাংলাদেশের যশোর জেলার বাটাজোর গ্রামে অমলাশঙ্করের জন্ম হয়। মাত্র এগার-বার বছর বয়সেই বাবা অক্ষয়কুমার নন্দীর সঙ্গে প্যারিস শহরে আন্তর্জাতিক কলোনিয়াল এক্সপোজিশনে যোগ দিতে যান অমলা। এই প্যারিস যাত্রা বদলে দিয়েছিল অমলার পুরো জীবনটাই। ওখানেই তাঁর সঙ্গে উদয়শঙ্করের প্রথম দেখা হয়। তাঁর মধ্যে নৃত্যশিল্পীকে আবিষ্কার করেন উদয়শঙ্কর। নাচ শেখার শুরুও প্যারিসে থাকাকালীনই। বাবার অনুমতি পেয়ে উদয়শঙ্করের ড্যান্স ট্রুপের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে ইউরোপ ট্যুর করেন। ইউরোপ থেকে ফিরে এসে কলকাতায় ইণ্ডিয়ান জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন, বহরমপুর কলেজের বার্ষিক উৎসব সভা, পাবনা সৎসঙ্গ উৎসবের মহিলা সভা প্রভৃতি জায়গায় তাঁর ভ্রমণ সম্পর্কে বক্তৃতা দিয়েছিলেন। এরপর বাবার উৎসাহে লিখতে শুরু করেন তাঁর বিদেশ ভ্রমণ কাহিনি 'সাত সাগরের পারে'। ১৯৩৫ সালে প্রকাশিত হয় বইটি। সেইসময় আনন্দবাজার, যুগান্তর, দেশ প্রভৃতি জনপ্রিয় কাগজ ও পত্রপত্রিকায় লেখাটির সম্বন্ধে প্রশংসামূলক আলোচনা প্রকাশিত হয়েছিল। ২০০৭ সালে বইটি পুনঃপ্রকাশিত হয়েছে। নৃত্যের পাশাপাশি পেন্সিল আর তুলিতেও তিনি সমান স্বচ্ছন্দ। তাঁর আঁকা ছবির প্রদর্শনীও হয়েছে। চলচ্চিত্রে মাত্র একবারই অভিনয় করেছেন - উদয়শঙ্কর পরিচালিত এবং অভিনীত 'কল্পনা' চলচ্চিত্রের নামভূমিকায়। ২০১২ সালের কান চলচ্চিত্র উৎসবে এই চলচ্চিত্রটি নতুন করে দেখানো হল। ১৯৪২ সালে খ্যাতনামা নৃত্যশিল্পী উদয়শঙ্করের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। তাঁর কন্যা মমতাশঙ্কর ও পুত্র প্রয়াত আনন্দশঙ্করও স্ব স্ব ক্ষেত্রে খ্যাত। এখন নতুন করে তাঁর জীবনের নানাদিক নিয়ে বই লেখার কথা ভাবেন পঁচানব্বই-এর এই চিরতরুণী।

কিছু কিছু মানুষ আছেন যাঁদের উপস্থিতি হৃদয়কে আলোকিত করে। অমলাশঙ্করের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে প্রথম দর্শনে ঠিক এই কথাটাই মনে হয়েছিল। যেন জীবনের সব তুচ্ছতার উর্দ্ধে এক 'আনন্দ'ময় জগতে তাঁর বাস। যে জগতে সঙ্গী তাঁর নানান সৃষ্টি আর পুরোনো সব মধুর স্মৃতি। কখনও পরিষ্কার বুঝতে পারি তাঁর কথা, কখনোবা নিজের মধ্যে নিজে ডুবে যান - ছিঁড়ে যায়, জড়িয়ে যায়, হারিয়ে যায় জীবন ঘুড়ির সুতোগুলো। তারপরে নিজেই হাসিমুখে বলেন, 'তোমরা একটু গুছিয়ে নিও'। এই হাসিটি লেগে থাকে প্রথম দেখা থেকে শেষ বিদায়ের মুহূর্ত পর্যন্ত। 'সাত সাগরের পারে' - চোদ্দো বছরের মেয়ের লেখা ভ্রমণ কাহিনিটি পড়ে মুগ্ধ হয়েছিলাম। আনন্দ পেলাম সেইসব কথা সামনাসামনি তাঁর মুখ থেকে শুনে। মন ভরে গেল। তাঁর আশীর্বাদ আমাদের চলার পথে পাথেয় হোক।

◆ 'সাত সাগরের পারে' পড়লে মনেই হয়না বাংলার এক অখ্যাত গ্রামের একটি চোদ্দো বছরের মেয়ের লেখা পড়ছি। সম্ভবত এই লেখাটিই সবচেয়ে কমবয়সে কোনো বাঙালি মেয়ের লেখা বিদেশ ভ্রমণ কাহিনি। বেড়ানো নিয়ে লেখার কথা সেই বয়সে কী করে মনে হল, বাবার লেখা 'বিলাত ভ্রমণ' বইটিই কি অনুপ্রেরণা ছিল না কি নিজের ভাবনা থেকেই?

☐আমিতো গ্রামের মেয়েই ছিলাম। আমাদের বাড়ি ছিল বাংলাদেশের যশোর জেলায়, বাটাজোর গ্রামে। এখনও গ্রামের কথা মনে পড়ে। ভারি সুন্দর ছিল ছেলেবেলা। জয়েন্ট ফ্যামিলি। বাবা-মা, জ্যেঠা-কাকারা, জ্যেঠাইমা, আমরা ভাই-বোনেরা। খড়ের চাল দেওয়া মাটির বাড়ি ছিল। মায়ের সঙ্গে ঘরের কাজও করেছি, ঘর লেপতাম সুন্দর করে। সেই আমার প্রথম বাইরে যাওয়া একেবারে অন্যদেশে। ইউরোপ থেকে ফিরে এসে বেশ কয়েক জায়গায় বেড়ানো নিয়ে বক্তৃতা দিয়েছিলাম। আমার বেড়ানোর গল্প শুনে অনেকেই বললেন লেখার জন্য। তবে লেখা শুরু করেছিলাম বাবার উৎসাহেই। আমাকে নিয়ম করে রোজ বেশ কয়েক পাতা লিখতে বলতেন। তখনতো ছোট ছিলাম, একেক দিন বায়না জুড়তাম যে আজ আর লিখব না। অন্য কোনো ভ্রমণ কাহিনি পড়িনি। বাবার লেখার প্রভাবও সেভাবে ছিল না। একেবারেই নিজের থেকে লেখা।

◆ আপনার লেখা পড়ে একটা পরিণত মনের পরিচয় পাওয়া যায় এই অর্থে যে বারো বছরের বিস্মিত বালিকার দৃষ্টি নিয়ে কিন্তু আপনি নতুন দেশ দেখেন নি। প্যারিসের লুভর মিউজিয়াম, আইফেল টাওয়ার কিম্বা রোমের সেন্ট পিটার্স গির্জা, কলোসিয়াম এই সবকিছু সম্বন্ধেই ওই বয়সেই একটা প্রাথমিক ধারণা ছিল। মনে হয় ইউরোপ সম্পর্কে বই পড়া বা গল্প শোনা ছিল আপনার। সেও কি বাবার উৎসাহে বা তাঁর কাছে শুনে?
☐বেড়ানোর লেখা কিছু না পড়লেও অনেক বই পড়তাম। আমার বইয়ের প্রত্যেক পরিচ্ছেদের ওপর দেখবে বিভিন্ন বই থেকে লাইন তোলা আছে। এইসব বই, কবিতা আমার পড়া ছিল। শুরু করেছিলাম সমুদ্র যাত্রা দিয়ে - 'ওই মহাসিন্ধুর ওপার থেকে কি সঙ্গীত ভেসে আসে' [গুনগুন করে ওঠেন গানের একটা কলি], কিম্বা তার পরে রবীন্দ্রনাথের সেই লাইন - 'লেগেছে অমল ধবল পালে মন্দ মধুর হাওয়া'। এক্সিবিশনের কথা লিখেছি যেখানে - 'চম্পক নগরে রায় চাঁদ সদাগর। বাণিজ্য করিতে আইল দক্ষিণ নগর।। চৌদ্দ ডিঙ্গা সঙ্গে দুর্গার অধিষ্ঠান। মহা ধনবন্ত সাধু রাজার সমান।।' [মনসামঙ্গল থেকে কয়েকটা লাইন আবার সুর করে বলেন।] প্যারিস যাওয়ার সময় বাবা একটা মোটা এনসাইক্লোপিডিয়া সঙ্গে নিয়েছিলেন। আমরা যখন কোথাও বেড়াতে যেতাম বাবা জায়গাটার সম্বন্ধে এনসাইক্লোপিডিয়া থেকে পড়ে শোনাতেন, ফলে একটা ধারণা তৈরি হয়ে যেত।

◆ আপনার বাবা অক্ষয়কুমার নন্দীর লেখা 'বিলাত ভ্রমণ' বইটিও সেইসময়ে বাঙালির চোখে ইংলণ্ড দেশটিকে চিনে নিতে আমাদের সাহায্য করে। লেখাটির বৈশিষ্ট্য এটাই যে অনেক খুঁটিনাটি সাধারণ ব্যাপার উঠে এসেছে যে দেখা ঠিক বাইরে থেকে পর্যটকের দৃষ্টিতে নয় বরং অনেক আন্তরিক। বইটি পড়লে স্বাভাবিকভাবেই এই লেখার বাইরে মানুষটিকে চেনার আগ্রহ বাড়ে আমাদের। লেখক, ব্যবসায়ী এবং মানুষ হিসেবে তাঁর জীবনের অজানা নানা দিকের কথা শুনতে চাই আপনার মুখে।

□ আমাদের ছেলেবেলায় কলকাতায় বড়লোকদের মধ্যে বাবু কালচার ছিল - বাবুয়ানা বলে না? গাছের গায়ে রুপো দিয়ে রঙ করছে। মুক্তো ভস্ম করে পানের সঙ্গে মিশিয়ে খেত। আমার বাবা কিন্তু অন্যরকম ছিলেন - একেবারে ওসব পছন্দ করতেন না। বাবার একটা চিঠি অনেকদিন পরে আমার হাতে আসে। আমার বিয়ের পরপরই লিখেছিলেন। চিঠিটা যখন আমি পড়ি তখন আমার ষাট-পঁয়ষট্টি বছর বয়স হবে। আমাকে মেয়েদের নিয়ে কাজ করতে বলেছিলেন। বাবা নিজেও মেয়েদের কথা খুব ভাবতেন। মেয়েদের শিক্ষা, স্বাধীনতার ওপরে জোর দিতেন। মেয়েদের জন্য 'মাতৃমন্দির' নামে একটি পত্রিকা করেছিলেন। পত্রিকাটি দীর্ঘদিন ধরে চলেছিল। তখনকার দিনের নাম করা সব লেখিকারা রাধারানী দেবী, সরলা দেবী, অবলা বসু এঁরা লিখতেন। অবলা বসু, চিত্তরঞ্জন দাশ, সত্যজিৎ রায়ের মা সুপ্রভা রায় এদের মত কয়েকজনের সঙ্গে একসাথে বাবা 'বিদ্যাসাগর বাণীভবন' নামে মহিলাদের জন্য একটি প্রতিষ্ঠানও তৈরি করেছিলেন। এঁরা নিয়মিতই আমাদের বাড়িতেও আসতেন। রাধারানী দেবীতো বাবাকে বলতেন, আপনার হাতেই আমার লেখালেখির শুরু। মেয়েদের নিয়ে একটা সংগঠনও করার ইচ্ছে ছিল বাবার। নাম ভেবেছিলেন - কন্যাতীর্থ। আমার ইচ্ছে করে যদি সেটা করা যেত। আনা পাভলোভা যেবার কলকাতায় এসে নৃত্য প্রদর্শন করেন সেবার অনেক ভদ্র ঘরের মেয়েরা টিকিট কেটে সেই অনুষ্ঠান দেখেছিলেন। এই ব্যাপারটা নিয়ে তখনকার খবরের কাগজে খুব নিন্দা করে বেরিয়েছিল। বাবা কিন্তু 'মাতৃমন্দির'-এ লিখলেন আমাদের আজ খুব আনন্দের দিন যে ভদ্রঘরের মেয়েরাও টিকিট কেটে থিয়েটার দেখছে। আমার নিজের ক্ষেত্রেও এই ঘটনা ঘটেছে। 'সাত সাগরের পারে' লিখেতো প্রচুর প্রশংসা পেলাম। কিন্তু তারপর যখন প্রথমবার নাচের অনুষ্ঠান করলাম, কাগজে খবর বেরোলো - অমলার অধঃপতন (হাসি)।
আমার বাবা-জ্যাঠারা সকলেই স্বদেশি আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তখন গ্রামের সধবা মেয়েরা কাঁচের চুড়ি পরত। বাবা সেই রেশমী চুড়ি তাঁদের ভেঙ্গে ফেলতে বলতেন। তাঁরা বলতেন, আমরা সধবা, হাত খালি রাখব! বাবা বলতেন, দেশ স্বাধীন হোক, আমি সবাইকে সোনার চুড়ি পরাব। এখান থেকেই জুয়েলারির দোকান করার কথাটা তাঁর মনে হয়েছিল।

জাকোশ্লোভাকিয়ার সেনাপতির বাড়িতে পেনসিলে আঁকা কিশোরী অমলার প্রতিকৃতি

গ্রামে আমাদের পরিবার স্বচ্ছল ছিল। বাবা কলকাতায় 'ইকনমিক জুয়েলারি' নামে একটি গয়নার দোকান খোলেন। দোকানটার এত সুনাম হয়েছিল যে ১৯২৪ সালে যখন লণ্ডনে আন্তর্জাতিক এক্সিবিশন হয় তখন ইংরেজ সরকারের তরফে অংশগ্রহণের জন্য বাবাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। বাবা তাতে রাজি হন নি। বাবা বলতেন আমাদের জামাকাপড়ের ব্যবসা সব ম্যাঞ্চেষ্টার কেড়ে নিয়েছে। এবার কী গয়নাও নেবে? বাবা নিজেই ব্যবস্থা করে লন্ডনে গিয়ে এক্সিবিশনে যোগ দিয়েছিলেন। পরের বারে প্যারিস থেকে আমন্ত্রণ আসায় আমরা যাই। তখনতো আর এখনকার মত হ্যান্ডিক্রাফটসের এত কদর ছিল না। বাবা ভারতের নানারকম দেশীয় জিনিস নিয়ে গিয়েছিলেন। বুদ্ধি খাটিয়ে প্রচুর খই দিয়ে প্যাকিং করেছিলেন যাতে সেগুলো না ভাঙ্গে আবার ভারীও না হয়। সেই খই আবার পরে হাতিদের খাওয়ানো হত। সেই দৃশ্যও লোকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখত।
বাবার উৎসাহেই 'সাত সাগরের পারে' লিখি। লেখাপড়ার ব্যাপারে যেমন নিয়ম মানতেন আবার এমনও হত কোনদিন হয়তো বৃষ্টি পড়ছে, বাবা বলতেন, বৃষ্টি পড়ছে, চল আজ তোমাদের পড়াশোনার ছুটি। আবার কোনদিন মাটিতে চাল ছড়িয়ে দিয়ে আমাদের ভাইবোনদের বলতেন, ভারতবর্ষের ম্যাপ বানাওতো। এমন সুন্দর ছিল ছেলেবেলাটা (আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে মুখ)।

◆ সাত সাগরের পারে - আপনার প্রথমবার ইউরোপ ভ্রমণ বলতে গেলে আপনার জীবনকেই বদলে দিয়েছিল। নাচ শেখা থেকে শুরু করে উদয়শঙ্করের সঙ্গে দেখা হওয়া সবই এই ভ্রমণেই। বারো বছরের মেয়েকে নিয়ে বিদেশে পাড়ি বা বাবা-মা ছাড়াই উদয়শঙ্করের নাচের দলে ইউরোপ ভ্রমণ সেইসময়ের তুলনায় আপনার বাবা-মায়ের ভাবনাচিন্তা অনেকটাই আধুনিক ছিল। এখন পিছন ফিরে তাকিয়ে এই দুটো বিষয়ে কী মনে হয় আপনার?

আমার বাবা-মা অন্যরকম ছিলেন। এটাতো বাবার দ্বিতীয়বার বিদেশ যাওয়া। এর আগে যখন বিলেতে যান, তখন আমি খুব ছোট। দ্বিতীয়বারে প্যারিস থেকে আমন্ত্রণ এসেছিল এক্সিবিশনের জন্য। যাওয়ার তিনদিন আগে বাবা আমাকে বললেন, অমু বিলেত যাবি? আমিতো এককথায় রাজি। ওই তিনদিনের মধ্যে আমার টিকিট, পাসপোর্ট সব হয়ে গেল। আমি তখন কলকাতায় সবে স্কুলে কয়েকদিন হল ভর্তি হয়েছি। মাও ছিলেন না। আমাদের বোর্ডিং-এ রেখে গ্রামে গেছেন। এদিকে আমি তো প্যারিস চললাম। ওখানে গিয়ে আমাদের এক্সিবিশনের আয়োজন করতেই ছ'মাস লেগে গিয়েছিল। বাবার সঙ্গে তার মধ্যেই প্যারিস, রোম, আরও বিভিন্ন জায়গা ঘুরে দেখেছিলাম। লোকে প্যারিস যায় ড্রিঙ্ক করতে, মৌজ করতে। বড়জোর লুভর মিউজিয়াম দেখে। আমরা ওখানে মোট নিরানব্বইটা মিউজিয়াম দেখেছিলাম। বাবা আমাকে প্যারিসের অপেরা, কাজিমো-দি-প্যারি, ফলিব্রেজার এসব দেখিয়েছিলেন।
বিশাল এলাকা নিয়ে এক্সিবিশনটা হয়েছিল। আমাদের 'ইকোনমিক জুয়েলারি'র স্টলটা যে প্যাভিলিয়নে ছিল, তার নাম ছিল 'হিন্দুস্থান প্যাভিলিয়ন'। এই বাড়িটা আগ্রার 'ইতমৎ-উদ-দৌলা'র আদলে করা হয়েছিল। এই এক্সিবিশনে কতগুলো যে কলোনিয়াল দেশ যোগ দিয়েছিল - হল্যাণ্ড, আফ্রিকা, জাভা - কত মানুষের সঙ্গে, তাদের সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলাম। ইন্দোনেশিয়ার থেকে আঙ্কোরভাটের মন্দিরের আদলে স্টল করেছিল। মাপেও একরকম। আফ্রিকা থেকে উইয়ের ঢিপির মতো কুঁড়েঘর বানিয়েছিল। কয়েকটি আফ্রিকান পরিবারকেও সেখানে রাখা হয়েছিল। তারা গাছের ডাল কেটে হাতা বানিয়ে রান্না করত। সেইসব দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতাম। ভারী ভালোলাগত।
এই এক্সিবিশনেই প্রথম মিস্টার শঙ্করকে দেখেছিলাম। যদিও নাম জানতাম কিন্তু আমার ধারণা হয়েছিল উদয়শঙ্কর একজন ওল্ড ম্যান, রবীন্দ্রনাথের মত। একদিন আমাদের স্টলে বসে আছি, দেখি কোট-প্যান্ট পরা কয়েকজন ইয়ংম্যান আসছেন। দেখে মনে হল আমাদের দেশের। আমিতো দৌড়ে গেছি, 'আর ইউ ইণ্ডিয়ান, আর ইউ ইণ্ডিয়ান' বলে। আমারতো তখন ওরকম এগার-বারো বছর বয়স। ওনারা স্টলের বাইরে বাবার নাম দেখে এসেছেন, মিস্টার শঙ্কর বাবাকে চিনতেনও। ওঁদের বাড়িতে মাতৃমন্দির কাগজও যেত। তাঁদের মধ্যে একজন নিজেদের পরিচয় দিলেন - ইনি উদয়শঙ্কর, ইনি তিমিরবরণ, রাজেন্দ্রশঙ্কর, দেবেন্দ্রশঙ্কর। আমি তো 'উদয়শঙ্কর'কে দেখে অবাক! বাবার সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে মিস্টার শঙ্কর ওঁদের বাড়িতে আমাদের নেমতন্ন করলেন। বললেন, বাড়িতে ওনার মা, ছোট ভাই সবাই আছেন। আমিতো আনন্দে লাফিয়ে উঠলাম। কতদিন বাড়ি ছেড়ে এসেছি। মাকে দেখিনি, ভাইদের দেখিনি। দেশ থেকে এত দূরে এসে আরেকটা ভাইকে দেখতে পাব বলে খুব আগ্রহ হচ্ছিল। ওঁদের বাড়িতে গেলাম। ওঁর মা আমাকে প্রথম দিন থেকেই নিজের মেয়ের মত দেখেছিলেন। আমারও মায়ের অভাবটা পূরণ হয়ে গিয়েছি। রবুর (রবিশঙ্কর) সঙ্গে প্রথম দিন থেকেই খুব ভাব হয়ে গিয়েছিল। আমার এক ভাইও একদম ওরই বয়সী। ওখানে আমরা দুজন খুব খেলা করতাম। সারাক্ষণ বাগানে ঘুরে বেড়াতাম। একদিন ওর বাবা বললেন, তোমরা খালি খেলা করে সময় নষ্ট করছ, এস দুজনে বসে একটা রচনা লেখ, 'হাউ ডু ইউ লাইক প্যারিস'। তখন সবে একটু একটু ইংরেজি শিখেছি, দুজনে বসে গেলাম লিখতে। রবুতো একটু বাদেই

পা চুলকাচ্ছে, ছটফট করছে। একটু পরেই ওপরে চলে গেল, তারপর বারান্দা থেকে ডাক দিল, মা তোমাকে ডাকছেন। ওর বাবা বললেন, যাও। ওপরে গিয়ে দেখি এক বাস্কেট টাটকা চেরি এসেছে। দুজনে মিলেতো খুব চেরি খেলাম, আর তারপর ডায়েরিয়া [বলতে বলতে ছেলেমানুষের মতই হাসতে লাগলেন]। ওর সঙ্গে আমার এত সুন্দর একটা সম্পর্ক ছিল যে তোমাদের বোঝাতে পারব না সেই অনুভূতি - ভাই বল, বন্ধু বল। আরেকদিনের কথাও মনে পড়ে, খাটের ওপর মা বসে আছেন আর আমি আর রবু দুলে দুলে রামায়ণ পড়ছি। [দুলে দুলে সুর করে বলে উঠলেন কৃত্তিবাসী রামায়ণের কয়েকটা পদ]

তারপর একদিন উদয়শঙ্কর এসে বললেন, তুমি এভাবে হাত ঘোরাতে পারবে? আমি ঘোরালাম। আবার বললেন তুমি ওভাবে হাত ঘোরাতে পারবে?

প্যারিসের এক্সিবিশনে ইন্দোচীন প্যাভিলিয়নে আঙ্কোরভাট মন্দিরের রেপ্লিকা

'সাত সাগরের পারে'-র বর্তমান সংস্করণের পিছনের মলাট

আমি আবার ঘোরালাম [হাসিমুখে হাত ঘুরিয়ে মুদ্রাগুলি করতে করতেই কথা বলছেন]। তারপর শুনলাম উনি বাবাকে বলেছেন এই মেয়েটা নাচ করলে খুব ভালো হবে। বাবাকে বলেছিলেন ওকে আমাদের ইউরোপ ট্যুরে নিয়ে যেতে চাই, আপনি যদি রাজি থাকেন। বাবাতো রাজি হয়ে গেলেন। এদিকে আমার নাচ সম্বন্ধে তখন তেমন কোন ধারণাই ছিল না। গ্রামে থাকতে যেটুকু যাত্রা দেখেছি। তখন ছেলেরাই মেয়ে সেজে যাত্রা করত [সেই যাত্রার ধরণ কিছুটা অভিনয় করে দেখালেন হাত-মুখের ভঙ্গীতে]। প্রথম প্রথম স্টেজ ডেকরেশন হিসেবে আমি আর রবু একটা মুদ্রা করে বসে থাকতাম আর বাকীরা নাচ করত। ওই করতে করতেই শিখতে শুরু করি। উদয়শঙ্করের সঙ্গে প্রথমবার ইউরোপ ভ্রমণে আমরা ইউরোপের মোট আঠেরটি দেশের দুশো শহরে ঘুরেছিলাম। সে এক অপূর্ব অভিজ্ঞতা। প্রথম যেদিন উদয়শঙ্করের নাচ দেখেছিলাম সেদিনের অনুভূতি আমি কোনদিনও ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না। তখন এত ছোট ছিলাম যে ইয়াংম্যান দেখে মুগ্ধ হবার সেন্স হয়নি, তেমন করে কিছুই বোঝারও বয়স হয় নি। অথচ এমন একটা স্বর্গীয় অনুভূতি হয়েছিল...

◆ আপনার প্রথমবার ইউরোপ ভ্রমণ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে। এর পরেও একাধিকবার ইউরোপের বিভিন্ন জায়গায় গেছেন। বিশ্বযুদ্ধের আগে পরে অনেক জায়গাই আমূল বদলে গিয়েছিল। আপনার চোখে এই পরিবর্তনগুলো কেমন মনে হয়েছে?

☐ অনেক বদলে গেছে। লণ্ডন, প্যারিস তখন সুন্দর একেকটা শহর ছিল। প্যারিসে পাঁচতলার বেশি কোন বাড়ি ছিল না। রাস্তাঘাট খুব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ছিল। মানুষ অনেক বেশি আন্তরিক ছিল। এখনতো অনেক বাড়িঘর হয়ে একেবারে বদলে গেছে। কত পুরোনো গির্জা আর নেই, নতুন কয়েকটাও তৈরি হয়েছে অবশ্য। আমার একদম ভালো লাগেনি এই বদলটা। কলকাতাই কত বদলে গেছে। কলকাতা আমার ভালোও লাগে না। মাঝে মাঝেই ছোটবেলার সেই গ্রামের কথা মনে পড়ে। আমার ছোটবেলার গ্রামই সবচেয়ে ভালো। বাবাও গ্রামই ভালোবাসতেন।

◆ আপনার লেখা পড়ে জানতে পারি বাবার সঙ্গে ইউরোপ যাওয়ার আগে আপনি পুরী ও দক্ষিণ ভারতেও গিয়েছিলেন। পরবর্তীকালেও নৃত্যের সুবাদে ঘুরেছেন ভারতের বিভিন্ন স্থানে। বিদেশে গিয়েও আপনার ভারতীয়ত্বকে সবসময়েই আলাদা মর্যাদা দিয়েছেন। এত বিচিত্র দেশ আমাদের। ভারতের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরতে আপনার কেমন লেগেছে?

☐ ভারতে কত জায়গায় গেছি। কোনটা বলব বল, সব জায়গাই সুন্দর। হিমালয়ের পাহাড়, রাজস্থানের মরুভূমি, সমুদ্রের কত রূপ, নানারকম জলপ্রপাত...। দক্ষিণ ভারতে একেকটা সি-বীচ একেকরকম। কোথাও কুচকুচে কালো বালি, কোথাও লাল বালি দেখলে মনে হবে যেন অজস্র চুনি পড়ে আছে। বালির টুকরোগুলো চুনির মত লাল। কোথাও ঝকঝকে সাদা রুপোর মত বালি।

অন্য একটা গল্প বলি, ছোটবেলায় গ্রামে এক ব্রাহ্মণী ছিলেন, পিসি বলতাম। গ্রামে তো সব কাজ নিজেদেরই করতে হয়। একা একা বাসন মাজতে গেলে লোকে কী বলবে তাই দুপুরবেলায় পুকুরে বাসন মাজতে যাওয়ার আমায় বলতেন, অমলা যাবি? গল্প শোনাব তোকে। আমি বাসন মাজব আর গল্প বলব, আর তুই বসে বসে শুনবি। ভারতের যত পুরাণের গল্প, সাহিত্যের গল্প সব ওনার থেকে শুনেছি। বিয়ের পরে আলমোড়া যাচ্ছিলাম এরোপ্লেনে চড়ে। যখন প্রয়াগের ওপর দিয়ে যাচ্ছে দেখি যমুনার কালো জল এসে মিশেছে গঙ্গায়, দুই নদীর জল পাক খাচ্ছে, ঠিক যেন শিবের জটা, ছোটবেলায় শোনা কালিদাসের মেঘদূতের কথা মনে পড়ছিল। কোথাকার থেকে কখন কোন জিনিস যে মনে পড়ে! আরেকবার, রাঁচির কাছে একটা জলপ্রপাতের ধারে বেড়াতে গেছি। [নামটা অনেকক্ষণ মনে করার চেষ্টা করলেন] জোনা নাকী হুড্রু...? সেখানে হঠাৎ দেখি একটা কালো পাথর জলের মধ্যে আটকে আছে আর সেটাকে ঘিরে জলটা ঘুরছে, কী অপূর্ব লাগছে দেখতে। বেড়াতে গিয়ে বিভিন্ন জায়গার নুড়ি পাথর সংগ্রহ করাটা আমার নেশা। ওই আলমারিটার মাথায় পাত্রের মধ্যে অনেক নুড়ি দেখছ না, পৃথিবীর নানান জায়গা থেকে নিয়ে এসেছি। প্রত্যেকটা কিন্তু আলাদা আলাদা দেখতে - কোনটা দেখ একদম ডিমের মত, কোনটা গোল, কোনটা চৌকো। আমার খুব ভালো লাগে।

◆ আপনি নিজে বা উদয়শঙ্করের সঙ্গে পরেও পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরেছেন। কিন্তু আর আমরা কোন লেখা পেলাম না কেন? লেখিকা অমলা নন্দী কি হারিয়ে গেলেন নৃত্যশিল্পী অমলাশঙ্করের আড়ালে? পরে কি আর কখনোই লেখেন নি নিজের কথা, নিজের ভ্রমণ?

☐কত সুন্দর হাতের লেখা ছিল আমার - অনেকটা রবীন্দ্রনাথের ধরণের। সবাই কী প্রশংসা করত। এই বয়সে নিজে তো আর লিখতে পারি না, কিন্তু এখন আবার লিখতে ইচ্ছে করে। শুধু বেড়ানোর লেখা নয়, যা দেখেছি, যাদেরকে দেখেছি - ছোট থেকেই আমি খুব মিশুকে ছিলাম। যেখানেই গেছি সকলেই আমাকে ভালোবেসেছে। সেই এক্সিবিশনের সময়ে 'অমলা, অমলা' বলে ডেকে কতজনে আলাপ করেছে। তারপরে কতজনের সঙ্গে মিশেছি... কত মহান মানুষের সংস্পর্শে এসেছি। একবার একটা অনুষ্ঠানে গেছি মিস্টার শঙ্করের সাথে। বসে আছি - আমি, মিস্টার শঙ্কর, লেডি রাণু মুখার্জি। সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ এসেছেন। মিস্টার শঙ্কর উঠে দাঁড়িয়ে রাধাকৃষ্ণণকে বললেন, 'মিট মাই ওয়াইফ, অমলা'। রাধাকৃষ্ণণ হেসে বললেন, 'আর ইউ ইন্ট্রোডিউসিং মি টু অমলা! আই নো হার ফর আ ভেরি লং টাইম। সি স্যাং 'বন্দেমাতরম' ফর আস ইন নাইন্টিন থার্টি এইট। আমিতো শুনে অবাক সেই কবে ১৯৩৮ সালে কংগ্রেসের একটা অনুষ্ঠানে আমি 'বন্দেমাতরম' গেয়েছিলাম। উনি সেটা এখনও মনে রেখেছেন! উনিতো সারা পৃথিবীর কতরকম মানুষের সংস্পর্শে এসেছেন, অথচ এটা মনে রেখেছেন! ভাবো তো! আরেকবার বিধান রায় তাঁর চেম্বারে আমাকে আর মিস্টার শঙ্করকে ডেকে পাঠালেন। আমরা গেছি, বিধান রায় তাঁর

সেক্রেটারিকে বললেন জওহরলাল নেহরুকে ফোন করতে। ফোনটা মিস্টার শঙ্করকে ধরিয়ে দিলেন। নেহরুজী বললেন যে রবীন্দ্রনাথের এবার জন্মশতবর্ষ, সেই উপলক্ষে তাঁর কোন একটা লেখা নিয়ে নৃত্যাভিনয় করতে। মিস্টার শঙ্করতো প্রথমে রাজি হতে চাইছিলেন না যে রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি নিয়ে কিছু কাজ করতে হলে অনেক নিয়মকানুন মানতে হবে, এটা করা যাবে না, ওটা করা যাবে না, অনেক বাধানিষেধ আছে। পন্ডিতজী বললেন যে সেটা আমি দেখব। তখন মিস্টার শঙ্কর রাজি হলেন। কিন্তু কী নিয়ে করবেন কিছুতেই ঠিক করা যাচ্ছে না। এক-দেড় মাস মাত্র হাতে। বাড়িতে সব বই নিয়ে পাতা ওল্টাচ্ছেন - এটা না ওটা...। একদিন আমি বেগুন ভাজছি। উনি বেগুন ভাজা খেতে খুব ভালোবাসতেন। হঠাৎ ডেকে বললেন, অমলা রবীন্দ্রনাথের কোন কবিতায় রাজা, রানি আছে, সাধারণ মানুষ আছে এমন কিছু তোমার মনে পড়ছে? আমি রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এলাম, হাতে খুন্তি। তারপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে 'সামান্য ক্ষতি' কবিতাটা মুখস্থ বলতে শুরু করলাম। [বলেই হাসিমুখে শুরু করলেন -

"পথে লয়ে তারে কহিলেন রাজা,
"মাগিবে দুয়ারে দুয়ারে--
এক প্রহরের লীলায় তোমার
যে ক'টি কুটির হল ছারখার
যত দিনে পার সে-ক'টি আবার
গড়ি দিতে হবে তোমারে।

'বৎসরকাল দিলেম সময়,
তার পরে ফিরে আসিয়া
সভায় দাঁড়ায়ে করিয়া প্রণতি
সবার সমুখে জানাবে যুবতী
হয়েছে জগতে কতটুকু ক্ষতি
"]।

মিস্টার শঙ্কর হাতে একটা তুড়ি মারলেন। বললেন, এইতো হয়ে গেছে। তারপর সবাই মিলে রিহার্সাল শুরু হল। আমি রানির ভূমিকায় অভিনয় করেছিলাম। রানির যে সেই অহঙ্কার -

"রুষিয়া কহিল রাজার মহিষী,
'গৃহ কহ তারে কী বোধে!
গেছে গুটিকত জীর্ণ কুটির,
কতটুকু ক্ষতি হয়েছে প্রাণীর?
কত ধন যায় রাজমহিষীর
এক প্রহরের প্রমোদে!' "

ছেঁড়া শাড়ি পরেও কিন্তু রানির সেই অহংকার যায়নি। বাজারের ভিতর দিয়ে হেঁটে চলে যাচ্ছে আভিজাত্য ভরে। একটা আপেল হয়তো হাতে তুলে নিল, একটা কামড় দিয়ে পরক্ষণেই পছন্দ হল না, হেলায় ছুঁড়ে ফেলে দিল। দোকানদার দাম চাইলে, দাম কিসের? - এমন ভঙ্গিমায় হাত ঝাড়া দিয়ে এগিয়ে গেল। লোকে পেছন থেকে বলছে পাগলি [মুহূর্তে হাত ও মুখের ভঙ্গিমায় অমলা থেকে বদলে রানি হয়ে উঠলেন]। দিল্লিতে গিয়ে সেই অভিনয় করেছিলাম। ব্যাকগ্রাউন্ডে অনেক স্লাইড দিয়ে প্রাসাদ, বাড়িঘর এসব বানানো হয়েছিল। কিন্তু আলো পড়তেই ফিলামেন্টগুলো সব দেখা যাচ্ছিল, শ্যাডো এফেক্টটাই আসছিল না। আমার কী মনে হল, জলরঙ দিয়ে এমনিই রাস্তা-ঘাট, গাছ-পালা, সিদ্ধার্থ গাছের ডাল ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছেন এইসব আঁকতে শুরু করলাম। এবারে আলো ফেলতে কিন্তু একটা থ্রি-ডাইমেনশনাল এফেক্ট চলে এল, মনে হল যেন ওই রাস্তা দিয়ে হাঁটা যাবে। মিস্টার শঙ্করতো দারুণ খুশি। সকলেরই আমাদের এই অভিনয় খুব ভালো লেগেছিল।

দুবছর আগেইতো কান ফেস্টিভালে গিয়ে রেড কার্পেটে হেঁটেছিলাম। একজন আমার হাত ধরে নিয়ে গেল। হঠাৎ করে আমায় বলল একটু কিছু বলতে। আমিতো জানতামনা যে কিছু বলতে হবে, সেভাবে তৈরি হয়েও যাই নি। মাইক্রোফোনের সামনে গিয়ে মনে হল, বললাম, 'আই অ্যাম দ্য ইয়ংগেস্ট ফিল্মস্টার ইউ হ্যাভ অ্যাট কান দিস ইয়ার' । আমার তখন বয়স তিরানব্বই । [দুষ্টুমির হাসি মুখময়] গোটা হল হাততালিতে ভরে গেল।
এমন কত কথা মনে পড়ে...।

শ্রীমতী অমলাশঙ্করের আঁকা পেন্টিং - Love Divine

◆ মোবাইল ফোনে আপনার সঙ্গে প্রথম যোগাযোগ হল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, ভারতের স্বাধীনতা, সত্তরের নকশাল আন্দোলন এই সব পেরিয়ে আজকের ডিজিটাল যুগ - আপনার এই দীর্ঘ জীবন এও যেন এক বিচিত্র ভ্রমণ। আপনার এই যাত্রা আরও দীর্ঘতর হোক এই শুভকামনা করি।

□ এত সুন্দর জীবন আমার! ঈশ্বরের অশেষ আশীর্বাদ পেয়েছি। যখন যে সময়ে যেটা হবার ঠিক তাই হয়েছে। দেওয়ালে যে ছবিগুলো দেখছ, ওগুলোও আমার আঁকা। কী করে এঁকেছি জানি না। কোনো শিক্ষাতো ছিল না, যখন যা মনে হয়েছে, এঁকেছি। মিস্টার শঙ্করতো আঁকা শিখেছিলেন। উনিও আমায় বলতেন তুমি কেমন করে এভাবে আঁকো? কিছুদিন আগেও আমার আঁকা ছবি নিয়ে এক্সিবিশন হল। ভাবতে পার একেকটা ছবি ৭০০০ টাকা, ৯০০০ হাজার টাকায় বিক্রি হয়েছিল! দেওয়ালের দিকে হাত বাড়িয়ে দেখিয়ে বললেন, এই ছবিগুলো আমি বিক্রি করব না। উঠে দাঁড়িয়ে ছবি দেখাতে লাগলেন। এই ছবিটা দেখ - বুদ্ধ এখানে দেবতা নন, মানুষ। তাঁর সামনে কোলে শিশু নিয়ে দরিদ্র মায়ের মূর্ত্তি - এই যে রবীন্দ্রনাথ, সোক্রাতেস এঁরাও দেখছেন। ছবিটায় একটা আলো এসে পড়েছে - ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের স্বর্গীয় সম্পর্ক ফুটে উঠেছে। আমার কাজ, সৃষ্টি, আমার স্বামী, ছেলে-মেয়ে সবাইকে যেভাবে পেয়েছি। এই যা কিছু দেখছ সব আমার আনন্দ-র করা। এখন আর দুঃখে চোখে জল আসে না...। জীবন পরিপূর্ণ হয়ে গেছে।
তোমরাও আমার অনেক ভালোবাসা, আশীর্বাদ নাও।

(সাদা-কালো চিত্র - ' সাত সাগরের পারে ' থেকে গৃহীত)

সাক্ষাৎকার - দময়ন্তী দাশগুপ্ত

কেমন লাগল : - select -

মত দিয়েছেন : 19
গড় : 4.84

Like 15 people like this.

tell a Friend

আপনার মন্তব্য জানাতে ক্লিক করুন

আলোকিত হলাম, সমৃদ্ধ হলাম, বিস্ময় রোমাঞ্চিত করে গেল... দময়ন্তি আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ এমন অমূল্য রতনে "আমাদের ছুটি" সাজানোর জন্য। আমাদের ছুটির দীর্ঘায়ু কামনা করি।

- Kanchan Sengupta [2014-05-13]

Amalashankar-er asadharon sakshyatkar prakash karar jonyo editor-ke onek dhanyobad.

- Apurba Chattopadhyay [2014-05-06]

khub valo laglo lekha ti.bisheshoto fele asa diner onek khuntinati ghotona noy., itihaser i mukhomukhi holam jeno amra...sadhubad sreemoti damayanti dasgupta ke.

- shreyosee chakrabarty [2014-04-30]

To view this site correctly, please click here to download the Bangla Font and copy it to your c:\windows\Fonts directory.

For any queries/complaints, please contact admin@amaderchhuti.com
© 2011 - AmaderChhuti.com • Web Design: Madhuwanti Basu
Best viewed in FF or IE at a resolution of 1024x768 or higher

-->

বেড়ানোর মতই বইপড়ার আদতও বাঙালির চেনা সখ - তা ছাপা হোক বা ই-বুক। পুরোনো এই ভ্রমণ কাহিনিগুলির নস্টালজিয়া তাতে এনে দেয় একটা অন্যরকম আমেজ। আজকের ভ্রমণপ্রিয় বাঙালি লেখক-পাঠকেরা অনেকেই শতাব্দী প্রাচীন সেইসব লেখাগুলি পড়ার সুযোগ পাননি। 'আমাদের ছুটি'-র পাঠকদের জন্য এবার পুরোনো পত্রিকার পাতা থেকে অথবা পুরোনো বইয়ের কিছু কিছু নির্বাচিত অংশ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হবে পত্রিকার পাতায়।

[অক্ষয়কুমার নন্দী (১৮৮২-১৯৪৯) ছিলেন প্রথিতযশা অলঙ্কারশিল্পী। তাঁর দেশ ছিল অধুনা বাংলাদেশের যশোর জেলার বাটাজোড় গ্রামে। ছোট থেকেই ভালোবাসতেন অজানা পথে বেরিয়ে পড়তে। প্রথম ভ্রমণ সাত বছর বয়সে বাড়িতে না জানিয়ে স্টিমারে চড়ে। তিরিশ বছর বয়সে মাত্র বাইশ টাকা সম্বল করে ঘুরে আসেন উত্তর ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চল।
সাংসারিক অভাবের জন্য ছাত্রবৃত্তি পাস করবার পরই স্বর্ণকারের কাজ শিখতে শুরু করেন। একসময় কলকাতার পথে পথে হালুয়া-পুরী আর গোলাপী রেউড়ি বিক্রি করেছেন, বাংলাদেশের বিভিন্ন মেলায় ঘুরে ঘুরে বিক্রি করেছেন নিজের তৈরি গহনা। খুব সাধারণ অবস্থা থেকে নিজের পরিশ্রম এবং বুদ্ধির জোরে পরবর্তী জীবনে ব্যবসাক্ষেত্রে সফল হয়েছিলেন। স্বদেশী ভাবনায় বিশ্বাসী এই মানুষটি ভারতীয় অলঙ্কার শিল্প এবং হ্যান্ডিক্রাফটস প্রসারের লক্ষ্যে কলকাতায় 'ইকনমিক জুয়েলারি ওয়ার্কস' নামে একটি অলঙ্কারের কারখানা খুলেছিলেন। ১৯২৪ সালে লণ্ডনে এবং ১৯৩১ সালে প্যারিসে আন্তর্জাতিক শিল্প প্রদর্শনীতে অক্ষয়কুমার ভারতীয় অলঙ্কার নির্মাণ, গজদন্ত ও রত্নখচিত সূক্ষ্ম কারুশিল্পে তাঁর প্রতিভার পরিচয় দেন। তাঁর প্রথমবার লণ্ডন ভ্রমণ নিয়ে লিখেছিলেন 'বিলাত ভ্রমণ' বইটি। 'মাতৃমন্দির' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক অক্ষয়কুমার নন্দী মেয়েদের শিক্ষা এবং স্বাধীনতার লক্ষ্যেও নানান পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। সহধর্মিনী সুশীলা তাঁর কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত হয়ে 'মাতৃমন্দির' পত্রিকাটির সম্পাদনাও করেছেন। স্বনামধন্য নৃত্যশিল্পী অমলাশঙ্কর তাঁর কন্যা।
অক্ষয়কুমারের 'বিলাত ভ্রমণ' বইটি ১৯২৯ সালে প্রকাশিত হয়। এই বইয়ের ভূমিকায় আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় লিখেছিলেন, "আমি এইখানি পড়ে বুঝলাম, বেশ একটা খাঁটি রকমের ভ্রমণ। বইখানায় ইংরেজ জাতির বর্তমান civilization-এর বাহ্যিক চাকচিক্যের কথা বাদ দিয়ে বিলাতের সাধারণ রীতিনীতির কথা লেখা হয়েছে। বিশেষত তার মধ্যে আমাদের দেশের সম্মুখে ধরবার মতো বিষয়গুলি বেশি করে ফুটে উঠেছে। এতে বাংলায় লেখা আর আর বিলাতভ্রমণ থেকে এখানা বেশ একটু স্বতন্ত্র রকমের হয়েছে।"]

বিলাত ভ্রমণ

অক্ষয়কুমার নন্দী

চতুর্থ অধ্যায়

লণ্ডনের বিবরণ
রবিবারের চিঠি - প্রথম

বিলাতে প্রথম প্রথম গতিবিধি করতে কতটুকু সুবিধা অসুবিধা ভোগ করতে হয়েছে, তারই একটা চিত্র - লণ্ডন হতে আমার লিখিত ভ্রমণ বৃত্তান্ত কয়েকখানি চিঠি থেকে উদ্ধৃত করা গেল।
১৭ আগষ্ট - ১৯২৪
মধ্যাহ্নের আহার বাসায় শেষ করে বিকাল ৩টায় বেড়াতে বের হলাম। বাসার নিকট Kilburn High Road থেকে 8B নং বাস ধরে খানিকটা গিয়ে পথে New Oxford Streetএ এলাম। যদিও রবিবার - সবই বন্ধ রয়েছে - তবু বাইরেই অসংখ্য দেখবার রয়েছে। প্রায় বেশীর ভাগ দোকানগুলিতেই বড় বড় কাচের পরদা, তার ভিতর দিয়ে দোকানের প্রায় সব জিনিসই দেখা গেল। এই রাস্তার বড় বড় দোকান গুলির সাজসজ্জা অতি অপূর্ব্ব। আমি New Oxford Street পার হয়ে Oxford Street ধরে ক্রমাগত পূর্ব্বদিকে চলতে চলতে দু-ধারের দোকানগুলি অনেক দেখলাম। লণ্ডনের এই দুটি রাস্তাই সবচেয়ে বড় বড় দোকানে সজ্জিত।
পরে অন্য বাসে করে Westminister Bridge নামক টেমস্ নদীর উপরের সুন্দর পোলটি পার হয়ে সুবৃহৎ Waterloo Stationটি দেখলাম। এ ষ্টেশনটি সহরের প্রান্তে সুবিস্তীর্ণ স্থানব্যাপী। রেল ষ্টেসন যে এত বড় হতে পারে, তা না দেখলে কল্পনায় আনা যায় না। হাওড়া ষ্টেসনের কয়েকটা তার মধ্যে স্থান পেতে পারে। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত ষ্টেসনটিতে ঘুরে ফিরে দেখলাম। এখানে এসে আর এক নূতন বুদ্ধি মনে হল - টেমসের উপর দিয়ে পোল পার হয়ে এসেছি, এবার ফিরবার পথে Tube রেলে করে টেমসের নীচে দিয়ে যেতে হবে; "উপরে জাহাজ চলে, নীচে চলে নর" - দেখতে হবে। টেমসের সুড়ঙ্গ বলে যা বিখ্যাত সে কিন্তু এ নয়, সেগুলি সহরের পূর্ব্বে সমুদ্রের দিকে। আমি Charring Crossএর একখানা টিকিট করলাম।
আমাদের দেশের রেলপথে চলতে নূতন লোকের কত কি যে জিজ্ঞাসা করতে হয় আর কত যে আপিসের বাবুদের তাড়া খেতে হয়, তার অন্ত নাই। এখানে রেলপথের অজানা ব্যাপার আমাদের দেশ অপেক্ষা বহুগুণ বেশী, কিন্তু এমন ভাবেই সব লেখা রয়েছে যে, এত কাণ্ডকারখানার মধ্যেও কাউকে কিছু জিজ্ঞাসার আবশ্যক হয় না। সবই সুন্দর পরিষ্কার ভাবে বোঝান। কোন কোন স্থানে এমন বন্দোবস্ত রয়েছে যে, টিকিটের দামের পেনী কয়েকটা কলের মধ্যে ফেলে instruction মত কল টিপলেই যেখানকার টিকিট চাই সেখানকার টিকিট বের হয়ে পড়ে। অথচ সকলেই এ কাজটি সহজে বুঝে নিতে পারে। ষ্টেসনগুলিতে সিগারেট, ম্যাচ, চকলেট ও নানারকম ব্যবহার্য্য দ্রব্য কিনতে কলে পেনি দিয়ে কল টানলেই ঐ সব জিনিস বের হয়। আমি আড়াই পেনি দিয়ে একটি টিকিট বের করলাম। এখানে প্রতি দু' মিনিটে একখানা করে ট্রেণ টেমসের নীচে দিয়ে পার হয়।

ট্রেণে উঠবামাত্রই গাড়ী ছেড়ে টেমসের নীচের সুড়ঙ্গে প্রবেশ করল; টেমসের নীচেয় ট্রেণে চলতে অন্যান্য Underground পথের মতই মনে হল। মুহূর্ত্ত মধ্যে Charring Cross ষ্টেসনে গাড়ী এল। Charring Cross ভারী জমকাল স্থান। আমি এখানে আর একটি bus ধরে একেবারে Hyde-Park Corner অতিক্রম করে Marble Archএ এসে পৌঁছলাম। এখানে রবিবার বিকালে বহু লোকের সমাগম হয়। লোকে Hyde-Parkএ বেড়াতে আসে আর এই Hyde-Park Cornerএর কাছে নানা প্রকার বক্তৃতা হয় তাই শোনে। আমি এক একটি করে তিন-চার জায়গায় খানিকটা করে দাঁড়িয়ে নানা প্রকার বক্তৃতা শুনলাম।

একটা স্ত্রীলোকের বক্তৃতায় একটী কথা বড় মনে ধরল। তিনি বললেন "স্বর্গ বলে কোন স্থান আছে কিনা জানি না, কিন্তু খ্রীষ্টই আমার স্বর্গ - তাঁর অনুসরণই আমার স্বর্গভোগ।" তাঁর বক্তৃতার পর আমি খানিকটা তাঁর সঙ্গে গল্প করে বাসায় ফিরলাম।

রবিবারের চিঠি - দ্বিতীয়

২৪শে আগষ্ট -

আজ সকালকার কাজকর্ম্ম সম্পন্ন করে প্রথমে মনুমেন্ট দেখব বলে বের হলাম। লণ্ডনে অনেক বড় বড় মনুমেন্ট আছে তথাপি একটাই বিখ্যাত, শুধু মনুমেন্ট বলতে সেটাকেই বোঝায়। কোন্ busএ চড়তে হবে জানা নাই - অনুমানেই সেই দিকের একটা busএ চাপলাম। লণ্ডন-গাইড বই ছোট একখানা পকেটে ছিল, তাই দেখেই ঠিক করলাম - কোন খানে নামতে হবে। ৮ পেনির পথ চলবার পর মনোনীত জায়গায় পৌঁছে - নামলাম। নেমে দেখি মস্ত বড় একটা জায়গা, আটটি বড় বড় রাস্তার মোহনা এটা, একে Heart of the city বলা চলে। তিন দিকে তিনটা প্রকাণ্ড বাড়ী Bank of England, Royal Exchange, Mansion House. দেখলাম, প্রত্যেক রাস্তার মাথায় Undergroundএর সুড়ঙ্গ রয়েছে - একটা পথ ধরে নীচে গিয়ে দেখি রেলষ্টেসন, পাতালপুরীতে দ্বিতীয় এক লণ্ডন সহর। ষ্টেসনটির নাম 'ব্যাঙ্ক', মাটীর নীচে সুড়ঙ্গ-পথে নানা দিকে কয়েকটি রাস্তা গিয়েছে। তার প্রত্যেক দ্বারে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে যাবার পথ লেখা রয়েছে। রাস্তার গোলাকার ছাদ ও পাশের দেওয়াল বড় বিজ্ঞাপনের টিনের প্লাকার্ডে ঢাকা। লণ্ডন সহরের বিজ্ঞাপনের কথা বলতে গেলে সে স্বতন্ত্র আর এক প্রবন্ধ আরম্ভ করতে হয়, সেকথা এখন থাকুক। যেদিকে মনুমেন্টের রাস্তা লেখা রয়েছে সেইদিকে খানিকটা গিয়ে উপরে উঠলাম - একটু হেঁটেই মনুমেন্টে গিয়ে হাজির হলাম। রবিবার - কাজেই আজ উপরে ওঠা যাবে না - তার চারিদিকে ঘুরে দেখে নিকটেই London Bridge নামক টেমসের একটী পোলের উপর গিয়ে উঠলাম। লণ্ডনের মধ্যবর্ত্তী টেমসের ১২ মাইল পথের মধ্যে ২৫টা পোল, আর টেমসের নীচে পাঁচ-ছটা সুড়ঙ্গ-পথে কেবল ট্রেণ চলে। উপরেও রেলের পোল আছে। Bridge পার হয়ে অপর পারে এসে London Bridge নামক ষ্টেসনটিতে উপস্থিত হলাম। ওপারে দেখে এসেছি জমির নীচের ষ্টেসন, এপারে এ ষ্টেসনটি সাধারণ জমি ছেড়ে প্রায় ১৫ হাত উঁচুতে; দুই পারেই লণ্ডন সহর। ষ্টেসনটীতে খানিকটা বিশ্রাম করা গেল। এখানে আমি সাত পেনির কয়েক রকম ফল ও দু'পেনির পাউরুটী কিনে মধ্যাহ্নের ভোজন সম্পন্ন করলাম।

এখান থেকে সুবিখ্যাত London Tower এবং Tower Bridge দেখব মতলব করলাম। একটী ট্রাম ধরে এক পেনির পথ অর্থাৎ প্রায় এক মাইল গিয়ে নামলাম - এটা কোন্ খানে এসেছি ঠিক করতে না পেরে সঙ্গের Guide বই দেখে একটা রাস্তা ধরে চলতে চলতে একটা ছোট বস্তীর ভিতরে গিয়ে পৌঁছলাম - দেখলাম অনেক ছোট ছোট বাড়ী, অনেক ছেলেমেয়ে পথে খেলা করছে।

বেশী ছেলে মেয়ে একস্থানে খেলতে দেখে আমার বড় আনন্দ হল, সেখানে একটু দাঁড়াতেই অনেক ছেলে মেয়ে আমার কাছে ছুটে এল - তাদের অনেকেই ভারতীয় মানুষের সঙ্গে কোন দিন পরিচয় করে নাই - তারা অল্প সময়ের মধ্যেই অনেক ভারতীয় কথা আমার কাছে শুনল এবং তাদের স্কুলের অভিজ্ঞতা থেকেও অনেক বলল। আমি Tower Bridgeএ যাব শুনে পথ দেখাবার উপলক্ষে অনেক ছেলে মেয়ে আমার সঙ্গে চলল - এখানে কুড়ি বছর বয়স পর্য্যন্ত মেয়েদেরও বালিকা সুলভ স্বভাব দেখলাম। যে এক দল ছেলে মেয়ে আমার সঙ্গে এল, তাদের মধ্যে দু'টী মেয়ে অনুমান আঠার কি কুড়ি বছরের। এরা দু'জনে খানিকটা পথ দেখিয়ে ফিরে গেল - আর ৮/১০ টী ছেলে মেয়ে আমার সঙ্গে এসে গল্প করতে করতে চলল। ঠিক Bridge যখন দেখা গেল, চারটি মেয়ে বাদে আর সব ছেলে মেয়ে ফিরে গেল। মেয়ে চারটি আমার সঙ্গে এসে Bridgeটীর সমস্ত বৃত্তান্ত আমাকে বলে ভাল করে দেখাল। জাহাজ চলবার সময় মাঝখানে কবাট খুলে দু'পাশে উঁচু করা হয় কি উপায়ে তাও দেখাল। বাস্তবিকই Tower Bridge একটী বিস্ময়কর জিনিষ।

পোল দেখান শেষ করে তাদের আর দু'টী মেয়ে ফিরে গেল, বারো তেরো বছরের দু'টী মেয়ে নদীর অপর অপর পারে আমাকে Tower দেখাতে চলল। আমি বললাম, তোমরা বাড়ীতে না বলে আমার সঙ্গে এতদূর চলছ, এতে তোমাদের বাপ মা রাগ করবে না ত? তারা বলল, না কিছুই না - এখন আমাদের স্কুলের গরমের ছুটীর দিন তাই আমরা এখন খুব বেড়াতে পারি। বুঝলাম, স্বাধীন দেশের মেয়ে বটে। আমাদের দেশের পল্লীগ্রামে একটা বিদেশী ইংরাজ গেলে ছেলে মেয়েরা ঘরের জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দেখে, যার বড় সাহস সে না হয় একটু নিকটে গিয়ে দাঁড়িয়ে দেখে - আর এই মেয়ে দু'টী নিঃশঙ্কচিত্তে, পরিচিত ভাইদের সঙ্গে চলার মত আমার সঙ্গে গল্প করতে করতে চলল। অল্পক্ষণেই আমরা পোল পার হয়ে Tower দরজা অতিক্রম করে ভিতরে ঢুকলাম। টেমসের তীরে খুব খানিকটা স্থান নিয়ে London Tower এর বড় বড় বাড়ীগুলি।

লণ্ডনের সব চেয়ে প্রাচীন ঐতিহাসিক দৃশ্য সকল এই Towerএর ভিতরে রয়েছে। রবিবার বলে ভিতরের জিনিষ সব বন্ধ। আমরা বাইরের জিনিষগুলি দেখলাম। বাইরেই এত দেখবার রয়েছে যে, একদিনে সেইগুলি দেখে শেষ করা দায়। টেমসের তীরে সারি সারি প্রায় একশত বড় বড় প্রাচীন কালের কামান রয়েছে। আহা, ভারতের জিনিষ দেখলেই প্রাণে কেমন লাগে! ভারতীয় কামানগুলি আমি দূর থেকে দেখেই চিনলাম। একটীর গায়ে লেখা রয়েছে - " ভরতপুর থেকে East India Company কর্ত্তৃক ১৮১৬ সালে আনীত।" দু'টী বড় পিতলের কামান দেখলাম, তার একটী ৭ হাত, অপরটী ১২ হাত দীর্ঘ। তাতে লেখা রয়েছে - "সলিমের পুত্র সলমন কর্ত্তৃক হিজরী ৯৩৭ সালে প্রস্তুত।" এত বড় কামান ভারতে তৈরী হয়েছে জেনে বড়ই আশ্চর্য্য বোধ হল। ভাবলাম - বিলাতে এই যে ভারতীয় এত বড় বড় কামান আনা হয়েছে, এর দু'একটা তো কলকাতা যাদুঘরে থাকা উচিত ছিল। কলকাতা যাদুঘরে আমরা যে ছোট দু'একটি পিতলের কামান দেখতে পাই, ওকেই ভারতীয় শিল্পের পরাকাষ্ঠা মনে করতাম, কিন্তু বিলাতে এত বড় বড় কামান ভারত থেকে এসেছে, এর খবর আমাদের দেশবাসী অনেকেই জানেন না।

এর পর আমরা চীন, জাভাদ্বীপ ও আফ্রিকা থেকে আনীত অনেক কামান দেখলাম, চীন ও জাভার কামানগুলিও বেশ বড় বড় এবং তার গায়ে সুন্দর সুন্দর চিত্র আঁকা।

এক পশলা বৃষ্টি এল, আমরা গেটের নীচেয় গিয়ে দাঁড়ালাম। সেখানে একটী বুড়ীকে পেয়ে তার সঙ্গে গল্প আরম্ভ করতেই সে, তার বাপ ভারতে মরেছে, সেই দুঃখের কাহিনী আরম্ভ করল। বৃষ্টি থামল কিন্তু বুড়ীর কাহিনী আর থামতে চায় না। পরে আমরা Towerএর আর আর বাগানবাড়ী প্রভৃতি অনেক দেখলাম। এই টাওয়ারটা অতি প্রাচীন কালে একটী জেলখানা ছিল - এখন একে একটা প্রাচীন ঐতিহাসিক প্রদর্শনীতে পরিণত করা হয়েছে। এর ভিতরেই কোহিনূর, রাজমুকুট ইত্যাদি রক্ষিত আছে।

মেয়ে দু'টী বাড়ী ছেড়ে এক মাইলের বেশী পথ এসেছে এখন এদের শীঘ্র করে বাড়ী ফেরাই উচিত, তা না করে এরা জানাল আমায় বাসায় পৌঁছাবার busএ তুলে দিয়ে তবে দু'জনে ফিরবে - কি সম্বন্ধই যে দু'এক ঘন্টার পরিচয়ে হয়ে গেল এদের সঙ্গে, তা বোধহয় কখনও ভুলব না। পথে চলতে চলতে এরা আমাকে অনেক নূতন বিষয় দেখাল। খানিকটা দেখাশুনার পর পুলিশকে জিজ্ঞাসা করে আমায় বাসায় ফিরবার busএ তুলে দিল। আমি চাইতেই তারা আমার নোট বইতে তাদের নামধাম দিল, আমি দু'জনকে মাত্র ৪টী পেনি উপহার দিলাম এবং ওয়েম্বলীতে একজিবিশনে গেলে আমার ষ্টলে দেখা করতে বলে আমার কার্ড দিলাম। বিদায়ের কালে তাদের দু'জনের কাছে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলাম; তারা আনন্দে আমাকে ট্রামে তুলে দিয়ে রুমাল তুলে গুড্ বাই, গুড্ বাই করতে করতে বিদায় নিল।

পঞ্চম অধ্যায়

[একজিবিশনে]
আমাদের কার্য্য

২৪ এপ্রিল (১৯২৪) বৃটিশ এম্পায়ার একজিবিশন খোলা হয়। সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ এর দ্বারোদ্ঘাটন করেন। একজিবিশনে ইংরেজ রাজত্বের প্রত্যেক দেশের জন্য পৃথক প্যাভিলিয়ন বা মণ্ডপ তৈরী হয়েছিল। পরম রমণীয় সুবিশাল ইণ্ডিয়া প্যাভিলিয়নের বেঙ্গল কোর্ট নামক অংশে আমাদের ষ্টল হয়েছিল। এইরূপ বিরাট প্রদর্শনীটির বিবরণ প্রত্যেকেরই জানা দরকার। এই পুস্তকের শেষাংশে বৃটিশ এম্পায়ার একজিবিশনের কিছু কিছু বিবরণ দেওয়া গেল।

বেঙ্গল কোর্টে বাংলা গবর্ণমেন্টের পক্ষ থেকে বাংলার কৃষিজাত দ্রব্য ও নানাবিধ শিল্পের ছয়টী ষ্টল হয়েছিল। তার মধ্যে বটকৃষ্ণ পালের ঔষধাদি, বেঙ্গল ক্যানিং এর রক্ষিত ফল ও মিষ্টাদি খাদ্য, এইচ. বসুর সুগন্ধি দ্রব্যাদি, ঢাকার কাপড় ও শঙ্খের শাঁখা, মুর্শিদাবাদের হাতির দাঁতের খেলনা, বাংলার বিভিন্ন স্থানের কাঁসা পিতলের বাসন প্রভৃতি ছিল। বাংলা থেকে কেবল আমরাই বে-সরকারী অর্থাৎ স্বাধীনভাবে আমাদের ইকনমিক জুয়েলারী ওয়ার্কসের অলঙ্কারের

একটি ষ্টল ক'রেছিলাম।

আমাদের ষ্টলে আমি প্রথমে শ্রীমতী মৃণালিনী ঘোষ নাম্নী একটী সম্ভ্রান্ত বংশীয়া বাঙ্গালী মহিলাকে ষ্টল-পরিচালনের কার্য্যে নিযুক্ত করি। এ সময়ে এঁর স্বামী লণ্ডনে ইণ্ডিয়ান সিবিল সার্ভিস পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। ইনি প্রদর্শনীক্ষেত্রে নানাদেশীয় সুশিক্ষিতা মহিলাকে কার্য্য করতে দেখে বাঙ্গালী মহিলার যোগ্যতা প্রদর্শনের জন্য নিজেই কার্য্যে নিযুক্ত হবার জন্য আমার কাছে প্রস্তাব করেছিলেন। শ্রীমতী ঘোষ শাঁখা-শাড়ী পরতেন, কপালে সিন্দুর পরতেন। অভিনব সাজে সজ্জিতা বাঙ্গালী মেয়ের তত্ত্বাবধানে বাংলার অভিনব ধরণের অলঙ্কারের দোকান ইয়োরোপীয়দের চক্ষে সত্য সত্যই খুব চিত্তাকর্ষক হয়েছিল।

মে, জুন দু'মাস একজিবিশন চলার পর আমাদের ষ্টলের বিক্রি খুব বৃদ্ধি পেল। তখন আমি আর দু'টি ইংরাজ কন্যাকে আমাদের ষ্টলে কার্য্যে নিযুক্ত করলাম। বড়টির নাম Miss Adams, বয়স ২৪ বৎসর, ছোটটীর নাম Miss Jones, বয়স ১৫ বৎসর। শ্রীমতী ঘোষ এবং এই দু'টী কন্যা - এঁরা সকলেই অতি সুন্দর ভাবে কাজ করতেন। সমস্ত কাজই নিজের কাজের মত যত্নের সঙ্গে করতে দেখে আমার বড় আনন্দ হত। এঁদের প্রত্যেককে আমি সাপ্তাহিক পৌণে তিন পাউণ্ড অর্থাৎ মাসিক কমবেশী পৌণে দু'শো টাকা হিসেবে বেতন দিতাম।

মিস জোনস্ নাম্নী ১৫ বৎসর বয়স্কা যে মেয়েটি আমাদের ষ্টলে কাজ করত, সে অল্প দিন হ'ল স্কুলের পড়া শেষ করেই আমাদের কাজে এসেছিল, তার সদানন্দ চঞ্চল ছুটোছুটিতে আমাদের ষ্টলটি আনন্দে ভরপুর থাকত। আমি তাকে একখানি বাংলার সাড়ী উপহার দিয়েছিলাম, ষ্টলে সে তাই পরে বাঙ্গালী বেশে গ্রাহকদের নিকট জিনিস বিক্রি করত। দর্শকগণ তাকে ভারতীয় মেয়ে বলে মনে করে কখন কখন ভারতীয় সংবাদের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করত, সে হেসে জানাত - সে ইংলণ্ডেরই মেয়ে। মিস জোনস্ অল্প বয়সের বালিকা হলেও স্বাস্থ্যের উৎকর্ষতায় তাকে পূর্ণাঙ্গ-সুন্দরীর মত দেখাত। এই পুস্তকে আমাদের ষ্টলের যে ছবি দেওয়া হয়েছে, তার মধ্যস্থলে এই কন্যাটি ঠিক বাঙ্গালী মহিলার মতই সুন্দর শোভা পাচ্ছে।

আমাদের ষ্টলের এই ইংরেজ মেয়ে দু'টি বড় শান্ত স্বভাবের ছিল, গ্রাহকদের নিকট বেশী কথা বলে জিনিস বিক্রির অত্যধিক চেষ্টা এরা কখনও করত না, আমিও এদের এই ভাব বেশ পছন্দ করতেম।

শনিবার একজিবিশনে খুবই ভিড় হত, আমি যে পরিবারে বাস করতাম, সেই বাড়ীর একটি বার বছরের মেয়ে প্রতি শনিবারে একজিবিশনে এসে আমার কাজের সহায়তা করত। শনিবারে বিলাতের ছেলে মেয়েদের স্কুল বন্ধ থাকে তাই একজিবিশনে আসার তার সুযোগ ছিল। হাসিখুসি স্বভাবের মেয়ে, এর কথা আগেও বলেছি। এ সেই ডলি, একে নিয়ে মাঝে মাঝে প্রদর্শনীর উৎসব ক্ষেত্রে বেড়িয়ে বড়ই আনন্দ পেতাম।

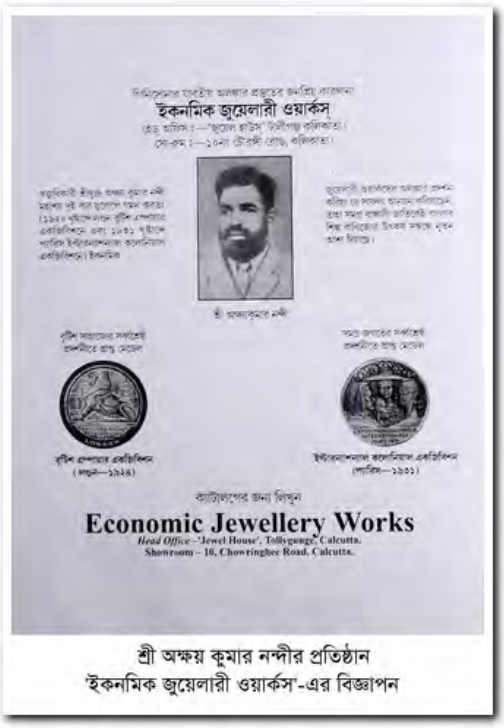

শ্রী অক্ষয় কুমার নন্দীর প্রতিষ্ঠান
'ইকনমিক জুয়েলারী ওয়ার্কস'-এর বিজ্ঞাপন

বিলাতে শ্রমসাপেক্ষ কাজগুলি পুরুষেরা করেন, অপেক্ষাকৃত অল্প পরিশ্রমের কাজ মেয়েরা করেন। ভাল ভাল দোকানে দ্রব্যাদি বিক্রয় অধিকাংশ স্থানে মেয়েদেরই কাজ। বৃটিশ এম্পায়ার একজিবিশনের কার্য্যকারকদিগের মধ্যে মেয়েদের সংখ্যা ছিল সতর হাজার। এ হতেই পাঠকগণ প্রদর্শনীর বিশালতা কিঞ্চিৎ অনুমান করতে পারেন।

বিলাতের মেয়েরা আমাদের দেশের মেয়েদের মত বেশী দামী গহনা পরা বিশেষ পছন্দ করে না। মোটামুটি গলায় সরু হার, কানে লম্বা দুল, হাতে একটা আংটি - এই তাদের গহনা। কেউ মাত্র একটি হাতে অতি সাদাসিদে রকমের ব্রেসলেট বা বালা পরে; আজকাল হয়েছে আর্মলেট, - তাগার মত একটা জিনিস ওপর হাতে পরে, গলার হারের স্থানে হাল ফ্যাসানে হয়েছে - এক রকম সরুমোটা মালা, এগুলি হাতিদাঁত, ঝিনুক, রঙ্গিন পাথর প্রভৃতির তৈরী; উপরে সরু আরম্ভ হয়ে ক্রমে নীচেয় মোটা।

আমাদের হাতিদাঁতের উপর গিনিসোনায় মোড়া 'বীণাপাণি শাঁখা' ইংরেজ মেয়েরা পছন্দ করেছে। 'বীণাপাণি আর্মলেট' নানা রকম খুবই বিক্রি হয়েছিল, কারণ আর্মলেট পরা ইংরাজদের হাল ফ্যাসান।

আমরা আমাদের অলঙ্কারের সঙ্গে হাতিদাঁতের প্রস্তুত নানা রকম সেপটীপিন, মালা, ফুল, লকেট, খেলনা, পুতুল প্রভৃতিও বিক্রয় করতাম; সেগুলো কতক আমাদের ঘরে আর কতক মুর্শিদাবাদের তৈরী।

বেঙ্গল-গবর্ণমেন্ট- ষ্টলগুলিতে যে সকল শিল্পদ্রব্য ছিল, তার মধ্যে বাংলার মেয়েদের হাতের প্রস্তুত লেস্, রুমাল ও নানা রকম সূচীশিল্প ছিল। অনেকগুলি সুন্দর কাঁথা বাংলার পল্লী থেকে সংগ্রহ করে একজিবিশনে পাঠান হয়েছিল। সেগুলো দেখে ইংরেজ-মেয়েরা বাংলার মেয়েদের ধৈর্য্যের খুবই প্রশংসা করত। কাঁথাগুলো এতই সুন্দর যে কোন কোন খানা ২০ পাউণ্ড অর্থাৎ পৌনে তিন শত টাকা পর্য্যন্ত বিক্রি হয়েছিল।

বিলাতের সর্ব্বত্র সমস্ত জিনিষই এক দরে বিক্রি, মূল্যবান দ্রব্য থেকে শাক তরকারী পর্য্যন্ত কোন জিনিষেরই দর দস্তুর করবার প্রথা নাই। এইরূপ সুনিয়ম থাকায় আমরা অল্প সময়ের মধ্যে অনেক জিনিষ বিক্রি করতে পেরেছিলাম।

তিনটী মেয়ের উপর সমস্ত কার্য্যভার দিয়ে আমি প্রদর্শনীক্ষেত্রের নানাস্থান ঘুরে নানাপ্রকার শিল্প-বাণিজ্য সম্বন্ধীয় দ্রব্যের বিষয় অবগত হতাম। ছ'মাস কালব্যাপী দীর্ঘ সময় একজিবিশন দেখবার সুযোগ পেয়েছিলেম, তথাপি অনেক বিষয় দেখতে সময় হয় নি।

প্রদর্শনীক্ষেত্র নানাপ্রকার আমোদ-উৎসবাদিতে সর্ব্বদা ভরপুর থাকত, আমরা অবকাশ মত সেগুলির কিছু কিছু দেখতাম। বিলাতে পথ ঘাটে সর্ব্বত্র সমপরিমাণ মেয়েপুরুষের গতিবিধি, কিন্তু প্রদর্শনী বা আমোদ-উৎসবাদিতে বেশীর ভাগ মেয়েরাই যোগ দিয়ে থাকেন। আমি দেখতাম, একজিবিশনের সমস্ত লোকের মধ্যে তিনভাগের দুইভাগই স্ত্রীলোক। প্রায় সকলেই ছোট ছেলে মেয়েদিগকে সঙ্গে নিয়ে আসতেন। শিশুদিগকে রাখবার একটী চমৎকার বাড়ী প্রস্তুত হয়েছিল। যে সকল স্ত্রীলোকের শিশুসন্তান বাড়ীতে রেখে আসবার সুযোগ নাই, তাঁরা সন্তান সঙ্গে করেই এসে ঐ স্থানে তাদের রেখে দিয়ে নিশ্চিন্তভাবে একজিবিশন দেখতেন। শিশুদের সেখানে রাখবার খরচ ৪ ঘন্টায় ছয় আনা এবং সমস্ত দিনের জন্য বার আনা নির্দ্ধারিত ছিল। সন্তান রাখবার কর্ত্তৃপক্ষেরা সন্তান রেখে অভিভাবককে একটি টিকিট দিতেন, সন্তান নেবার সময় ঐ টিকিট দেখিয়ে সন্তান ফিরিয়ে নিতে হত। শিশুদের আহারাদির ও সর্ব্বপ্রকার তত্ত্বের চমৎকার ব্যবস্থা সেখানে ছিল, অধিকন্তু সেখানে শিশুদের উপযোগী এমন সুন্দর সুন্দর আমোদ উৎসবের ব্যবস্থা ছিল যে, তাদের পক্ষে উহাই প্রদর্শনীর আমোদ উপভোগের জন্য যথেষ্ট হয়েছিল।

সহর ও পল্লী থেকে স্কুলের শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীগণ আপন আপন স্কুলের ছাত্র ছাত্রীগণকে নিয়ে একটী দল বেঁধে একজিবিশন দেখতে আসতেন। ঐ সকল শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীগণকে ছাত্র ছাত্রীদের প্রতি সন্তানের মত ব্যবহার করতে দেখতাম। তাদের সকলকারই জ্ঞানস্পৃহা অত্যন্ত প্রবল।

আমাদের ষ্টলে বিক্রয়ের জন্য হাতির দাঁতের প্রস্তুত তাজমহল, হাতির উপর সজ্জিত বেশে ভারতীয় রাজা, জগন্নাথের রথ, গরুর গাড়ী, ময়ূরপঙ্খী বাইচের নৌকা, বজরা নৌকা, রাধাকৃষ্ণ, শিবদুর্গা, বুদ্ধ, গৌরাঙ্গ প্রভৃতির মূর্ত্তি এবং নানাবিধ ভারতীয় জীবজন্তুর মূর্ত্তি দিয়ে সুসজ্জিত করা হয়েছিল। শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীগণ এবং অনুসন্ধিৎসু দর্শকগণকে আমরা ঐ সমস্ত জিনিষের বিবরণ শুনাতাম, তাতে আমাদের ষ্টলের সম্মুখে অনবরত ২৫ হতে ১০০ দর্শক উপস্থিত থাকত।

সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জের মহিষী রাণী মেরী একদিন বেঙ্গল কোর্টে এসেছিলেন, - আমাদের তৈরী অলঙ্কার দু'একটি হাতে নিয়ে দেখে প্রশংসা করেছিলেন। আর একদিন স্পেনের রাণী আমাদের ষ্টলে এসে 'বীণাপাণি আর্মলেট' কিনে নিজে পরেছিলেন; তাঁর সঙ্গে আর একটী রাজপরিবারস্থ কন্যা ছিলেন, তিনিও একটী কিনে হাতে পরেছিলেন।

একজিবিশনে সারা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মানুষ দেখতাম। ভারতের নানা প্রদেশের অনেক লোকও সেখানে একজিবিশন দেখতে গিয়েছিলেন। একটী বাঙ্গালী মহিলা নিযুক্ত হয়েছিলেন - বেঙ্গল গভর্ণমেন্টের বস্ত্রবিভাগীয় ষ্টলে; ইনি বাংলার সুবিখ্যাত বাগ্মী বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয়ের মধ্যমা কন্যা কুমারী লীলা পাল। ইংলণ্ডের নানাস্থানের বাঙ্গালী ছাত্র-ছাত্রীগণ আমাদের ষ্টলে আসতেন এবং বাংলার শিল্পকে বিলাতে সুপ্রতিষ্ঠিত করবার এই ক্ষুদ্র প্রয়াসের প্রতি অন্তরের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতেন। ১০।১২ টী বাঙ্গালী মহিলার সঙ্গে আমাদের বিশেষ পরিচয় হয়েছিল; তার মধ্যে শ্রীমতী লতিকা বসুর নাম এ দেশে অনেকেই জানেন।

মে মাসের প্রথমেই সুরু হয়ে অক্টোবরের শেষ পর্য্যন্ত ছ'টী মাস বেশ সরগরমের সঙ্গে একজিবিশনটি চলেছিল। এই ছ'টী মাস আমরা যে কত আনন্দে কাটিয়েছি, কত নূতনত্বের মধ্য দিয়ে চলেছি তা মনে করেও আনন্দ হয়।

বেঙ্গল কোর্টে ইংরেজ বাঙ্গালী স্ত্রীপুরুষে আমরা প্রায় পঞ্চাশ জন লোক কাজ করতাম, আমাদের সকলের মধ্যে বড়ই সদ্ভাব জন্মেছিল। একজিবিশন শেষ হবার পর আমাদের পরস্পরের এই বিচ্ছেদ আমাদের প্রাণে বড়ই ব্যথা দিয়েছিল।

বেঙ্গল গবর্ণমেন্ট - পক্ষ থেকে কলকাতা কো-অপারেটিভ সোসাইটীর রেজিষ্ট্রার রায় যামিনীমোহন মিত্র বাহাদুর, খাঁ বাহাদুর কোমরুদ্দিন আহম্মদ এবং শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র সেনগুপ্ত মহাশয় বেঙ্গল কোর্টের তত্ত্বাবধায়ক হয়ে গিয়েছিলেন। এঁরা প্রত্যেকেই আমাকে নানাভাবে সাহায্য করেছিলেন। এঁদের সহায়তায় আমি নানা অযোগ্যতার মধ্য দিয়েও আমাদের ষ্টলের কার্য্যে সফলতা লাভ করেছিলাম।

কলোনিয়াল এক্সিবিশনে ইকনমিক জুয়েলারি ওয়ার্কসের ষ্টল

একাদশ অধ্যায়

[লোকচরিত্র]

লণ্ডনে একদিন পথ চলতে হঠাৎ দেখলাম, মণিব্যাগ হারিয়েছি, খরচের পয়সা নাই - এক মাইল দূরে ব্যাঙ্কে গিয়ে খরচের টাকা আনতে যাব, অথচ আধ ঘন্টার পরেই ব্যাঙ্ক বন্ধ হবে। ট্রামে যাবার পেনিটি পর্য্যন্ত পকেটে নাই - তাই মনে হল, আজ পথের লোকের কাছে একটি পেনি চাইতে হবে। তারপর মনে একটা ঔৎসুক্য এল যে, এই পেনিটি চাওয়া যার-তার কাছে চাইব না, এই চাওয়া উপলক্ষে দেশটাকেও বুঝতে হবে। তাই খুব গরীব পোষাক পরা একটী চৌদ্দ বছরের মেয়েকে পথে দাঁড়িয়ে বৃষ্টিতে ভিজতে দেখে তারই কাছে বললাম, ট্রামে যাবার পয়সা নাই, আমাকে একটী পেনি দেবে? বলতেই দেখলাম, দুটী অর্দ্ধপেনি আমার হাতে দিল। বোধ হয় আধ পেনি দুটী মাত্রই তার সম্বল ছিল, সে আমাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করল না, আমার মুখের দিকেও চাইল না - পেনি দুটী দিয়েই পূর্ব্ববৎ দাঁড়িয়ে রইল। আমাদের দেশে এমন অপ্রত্যাশিত দান চাইতে হলে দাতার নিকট কিছু না কিছু কৈফিয়ৎ দিতে হত।

•

বৃটীশ এম্পায়ার একজিবিশনে আমাদের ষ্টলে একটী কারুকার্য্যপূর্ণ 'কাস্কেট' ছিল, তার দাম লেখা ছিল বাইশ পাউণ্ড। একজন আমেরিকান সেটা কেনার ইচ্ছা করে বললেন - এটী আমাকে বিশ পাউণ্ডে দিতে পারবেন কি? বিলাতে দরদস্তুরের রীতি নাই, আমরাও কখন নির্দ্ধারিত দামের চেয়ে কমে বিক্রি করতাম না। লোকটী কম দাম বলায় আমি আশ্চর্য্যান্বিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কম দাম বলছেন কেন? তিনি বললেন, এখানকার জিনিষ আমেরিকায় নিতে বিশ পাউণ্ডের বেশী দাম হলে কাষ্টম ডিউটী আর পাঁচ পাউণ্ড অতিরিক্ত দিতে হয়, তাই বাইশ আর পাঁচ সাতাশ পাউণ্ড জিনিসটীর দাম পড়ে। কিন্তু ঐ জিনিসের জন্য অত খরচ করতে পারি না, কুড়ি পাউণ্ডে পেলে আর কোন খরচ অতিরিক্ত বইতে হয় না। তাঁর এই কথা শুনে আমি যে উত্তর করলাম তা বলতে এখানে লজ্জা হচ্ছে; আমি বললাম, আপনি যদি বাইশ পাউণ্ডে জিনিসটী আমার কাছে ক্রয় করেন তবে আপনার কাষ্টম ডিউটী বাঁচাবার জন্যে আমি বিশ পাউণ্ডের একটী রসিদ আপনাকে দিতে পারি। আমার এই প্রবঞ্চনার প্রস্তাব শুনে লোকটী আর আমার সঙ্গে কথা কইলেন না। ধীরে ধীরে যে ভাবে তিনি প্রস্থান করলেন, তাতে বেশ বুঝলাম, দেশকে ফাঁকি দিতে পরামর্শ দেয় - এমন লোকের কাছে জিনিস কিনতে তিনি অত্যন্ত ঘৃণা বোধ করেন।

•

একদিন ট্রেণে খুব ভিড় হয়েছে, অনেক লোক গাড়ীতে দাঁড়িয়েই চলছে। ওদেশে ট্রেণে প্রায় সকলেই বই বা খবরের কাগজ কিছু-না-কিছু পড়তে থাকে। একটি লোক অপরের ঘাড়ের উপর খবরের কাগজ রেখে পড়ছে আর লোকটি পাঠকের সুবিধার জন্য ঘাড় নত করে রয়েছে, অথচ এদের দু'জনের মধ্যে পরিচয় নাই। দেশবাসী সকলের মধ্যে কি সুন্দর একাত্মবোধ!

•

পূর্ণ এক বৎসরের মধ্যে মাত্র দু'টি ছেলে দু'জায়গায় দেখেছি, পথে চলতে তাদের পায়ে জুতা ছিল না। তাদের প্রত্যেককেই জিজ্ঞাসা করে জেনেছিলাম - জুতা কিনবার পয়সার অভাব। এই দৈন্যকে তারা প্রকারান্তরে ঢাকতে চেষ্টা করে নাই। এইখানেই পেলাম তাদের মনের বলের পরিচয়।

•

একজিবিশনে আমাদের ষ্টলে একটি ১৫ বছরের মেয়ে কিছুদিন কাজ করেছিল, নাম তার ভায়োলেট, বড় ভাল স্বভাব। একদিন বেঙ্গল কোর্টের একটি বাঙ্গালী যুবক চা খাবার ঘরে তাকে একাকী পেয়ে হঠাৎ তার মুখচুম্বনে অগ্রসর হয়েছিল। সে আমার ষ্টলে তার চেয়ে বড় যে মেয়েটি কাজ করত তার কাছে ব্যাপারটা প্রকাশ করতেই বড় মেয়েটি বেঙ্গল কোর্টের প্রধান মেয়ে-কর্ম্মচারীর কাণে কথাটা দিল। সঙ্গে সঙ্গে বেঙ্গল কোর্টের এসিষ্ট্যাণ্ট কমিশনারের নিকট কথাটা অভিযোগ রূপে উপস্থিত হল। সেই দিন বিকালেই বিচার হয়ে যুবকটির চাকরী গেল। পরদিন যুবকটি মর্ম্মাহত হৃদয়ে আমাদের ষ্টলে এসে আমাকে জানাল যে, সে ভায়োলেটের সঙ্গে দেখা করতে চায়। আমি তাকে তিরস্কার করে জানালাম, আমি ভায়োলেটের সঙ্গে তোমায় দেখা করতে দেব না। ভায়োলেট ষ্টলের ভিতরে ছিল, সে এসে আমাকে বলল, যুবকটি কি বলে? আমি বললাম, তোমার তাতে প্রয়োজন নাই, পোড়ারমুখো তোমার সঙ্গে আবার কথা কইতে চায়! ভায়োলেট বলল - আমি যদি জানতাম, ওর চাকরী যাবে, তবে কথাটা আর প্রকাশ করতাম না, যাহ'ক, ও কি বলে আমি শুনতে চাই। আমি বাধা দেওয়া সত্ত্বেও সে যুবকটির কাছে গেল। যুবকটি বলল - আমি আমার চাকরী এবং যশঃ দুই-ই হারালাম, তুমি যদি আমার জন্যে এসিষ্ট্যাণ্ট কমিশনারের নিকট একটু অনুরোধ কর তবে আমি পুনরায় চাকরী পাবার জন্যে দরখাস্ত করতে পারি। ভায়োলেট তখনই ছুটে গিয়ে এসিষ্ট্যাণ্ট কমিশনারের নিকট যুবকটির দোষ ক্ষমা করতে অনুরোধ করে তার চাকরী বহাল করে দিল। অপরাধীর প্রতি কি আশ্চর্য্য ব্যবহার। কি ক্ষমা! কি উদারতা!

•

একদিন একটি দোকানে তাদের কারখানায় নুতন ধরণের তৈরী চুল-ঢাকা জাল বিলি হচ্ছিল। শত শত মেয়ে পুরুষ ঐ জিনিস পাবার জন্যে তাদের দোকানের সামনের প্রসারিত ক্ষেত্রে ভিড় করল। দোকানের মালিক নিকটে বা দূরে যাকে লক্ষ্য করে ফিতে ছুঁড়ে দিচ্ছিল, কেবল সে-ই মাত্র হাত তুলে ফিতে ধরছিল, আর ফিতে পাওয়া মাত্রই সে (আর ফাঁকি দিয়ে পুনরায় পাবার আশায় না থেকে) চলে যাচ্ছিল। আশ্চর্য্য এই যে বহু বহু লোকের মধ্যে অল্প সংখ্যক লোকের ভাগ্যেই ফিতে মিলছিল। কিন্তু এর জন্যে হুড়োহুড়ি নাই, নীরব নিশ্চল হয়ে দর্শকগণ ফিতে পাবার আশায় দাঁড়িয়ে ছিল। এক একজনের হাতে ফিতে পড়তেই তার পার্শ্ববর্তী দশ- পনেরো জনে হেসে আনন্দ প্রকাশ করছিল।- আমার মনে পড়ছিল আমাদের দেশের কথা, সভাক্ষেত্রে প্রোগ্রাম বিলির সময়েও লোকদের ধৈর্য্যের অভাবে সভাক্ষেত্র কি রকম গণ্ডগোলময় হয়ে ওঠে।

•

দু'টি ছেলে রাস্তায় মারামারি করছিল, রাস্তায় লোক দাঁড়িয়ে দেখছিল। যতক্ষণ তাদের ধস্তাধস্তি চলছিল ততক্ষণ কোন পথিকই তাদের এই কাণ্ডে বাধা দেয় নাই, কিন্তু যখন একটি ছেলেকে পরাস্ত করে অপরটি তার উপর বিষম মারপিট আরম্ভ করল, তখন পথিকেরা দু'জনকে তুলে পৃথক করে দিল। আশ্চর্য্য এই, দুটি ছেলেই পরস্পর নীরবে মুখের দিকে তাকিয়ে তাদের মনের ক্ষোভ মিটিয়ে দু'জনেই "গুডবাই" বলে বিদায় নিয়ে চলে গেল। ঠিক এমনই ঘটনা আর একদিন দু'টি মাতালের মধ্যে দেখেছিলাম, তেমনই বিদায়ের বেলায় "গুডবাই"। দেখলাম ঝগড়া হ'ক, মারামারি হ'ক তবুও সারা দেশ যেন ভাই ভাই।

•

লণ্ডনে একটি ছাপাখানায় এক হাজার কাগজ ছাপার একটি অর্ডার দিয়ে একখানা চেক দিয়ে দাম শোধ করে পাঠিয়েছিলাম। ছাপা ওয়ালারা ডাকে নির্দ্দিষ্ট সময়ে আমার লণ্ডনের বাসায় ছাপান কাগজ পাঠিয়ে দিয়েছে। কিন্তু কার্য্য গতিকে আমি তখন গ্লাসগোতে থাকায় সেগুলি গ্লাসগোতে আমার নিকট পৌঁছল। আমি দেখলাম, একটা অক্ষর বানান ভুল হয়েছে। গ্লাসগো হোটেলের ঝি-মেয়েটি এই বিষয়টি দেখেই আমাকে বলল, আপনি সেই ছাপাখানায় জানালেই তারা নূতন করে আপনাকে আবার ছাপিয়ে দেবে, তার জন্যে আপনাকে ছাপা খরচ, কাগজের দাম বা ডাক খরচ কিছুই দিতে হবে না। আমি ছাপাখানায় চিঠি দিয়ে জানাতেই ঠিক সময়ে আমার কাছে নূতন আর এক হাজার সংশোধিত ছাপান কাগজ এসে হাজির হয়েছিল। ছাপাখানার সততাই এখানে বড় কথা নয় - তার চেয়ে বড় কথা এই যে, একটি হোটেলের ঝিও নিঃসন্দেহে জানে যে, তাদের দেশের ব্যবসায়ীরা কখনও গ্রাহককে ঠকায় না, বা গ্রাহকের মনে অসন্তুষ্টি থাকতে দেয় না।

•

একদিন ট্রেণে চলছি, পথে একদল স্কুলের ছোট মেয়ে ট্রেণে উঠল। ওখানে তৃতীয় শ্রেণীতেও প্রত্যেক জনের জন্য এক একটি পৃথক বসবার স্থান। মেয়েগুলি ট্রেণে উঠেই খালি সিটগুলি অধিকার করে বসল, কিন্তু যখন দেখল, দশ বারোটি মেয়ে স্থান না পেয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তখন তারা সকলেই উঠে দাঁড়াল। তারপর অপরিচিত প্যাসেঞ্জারেরা ছোট মেয়েদিগের এক একটিকে টেনে নিয়ে কোলে বসাল, তারপর খালি সিটগুলিতে আর সব মেয়েরা বসল। মেয়েদের মধ্যে একাত্মবোধ আর প্যাসেঞ্জারদের কর্ত্তব্যজ্ঞান দুই-ই উল্লেখযোগ্য!

•

একজিবিশনে আইল অব ম্যান নামক দ্বীপে ভিজিটর অর্থাৎ দর্শক আমদানী করবার উদ্দেশ্যে সেখানকার মনোরম দৃশ্য সম্বলিত উৎকৃষ্ট কয়েক প্রকার ছবি বিতরণের জন্য এক স্থানে সাজিয়ে রাখা হয়েছিল। সেখানে বিলি করবার জন্য কোন লোক রাখা হয় নাই, কেবল লেখা ছিল - "প্রত্যেক ছবির এক একখানা করিয়া মাত্র লইবে।" একটি ছেলে তার মায়ের সঙ্গে এসে ঐ ছবি এক একখানা করে নিয়েছে; তারপর তার পছন্দমত ছবিখানির আর একখানা নেবার জন্য তার মায়ের আদেশ চাইতেই মা বললেন - "না, তুমি কখনই এক একখানার বেশী নিতে পার না।" ছেলেই বা কেমন সুন্দর শিক্ষা পেয়েছে যে, আর একখানা নিজ ইচ্ছায় তুলে না নিয়ে মায়ের অনুমতি চাইল; আর মা যে উপযুক্ত শিক্ষাদাত্রী মা - তার তো কথাই নাই।

•

ওদেশে কোন জন-সমাগমের প্রবেশ পথে যেখানে একটু ভিড় হয়, সেখানে কেউ ঠেলাঠেলি করে আগে যেতে চেষ্টা করে না - একের পর আর শ্রেণীবদ্ধ হয়ে যায়। পর পর লোক এসেই শ্রেণীর পশ্চাতে দাঁড়ায়। এ রকম শ্রেণী কখন একশত হাতের উপর দীর্ঘ হতে দেখেছি। একদিন দেখলাম, একটা উৎসব-ক্ষেত্রের প্রবেশ-দ্বারে উপরের আচ্ছাদনযুক্ত স্থান ছেড়ে লোকের শ্রেণী বাইরে অনেক দূর গিয়েছে। গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি এল তবু লোকগুলি শ্রেণী ভেঙে আচ্ছাদিত স্থানে এগিয়ে এলো না, পরে ধীরে ধীরে একে একে প্রবেশ করল। আমাদের দেশে কিন্তু এইরূপ ক্ষেত্রে সামনের লোক পিছনে ফেলে আগে ঢোকবার চেষ্টাটাই বেশী লোক করে, আর কোন কোনখানে এত লোকের চাপাচাপি হয় যে, তাতে কারো বা সর্দ্দিগর্ম্মি হয়, তার মাঝে আবার পকেটমার পর্য্যন্ত আমদানী হয়।

•

লিভারপুলের একটা বহুজনপূর্ণ হোটেলে একদিন সন্ধ্যার পর দেখলাম, একটি আমেরিকান যুবক একখানি পাউরুটি মাত্র খাচ্ছে। এই হোটেলটিতে অনেক গরীব লোক খায় বটে কিন্তু এমন শুধু রুটিমাত্র কিনে খেতে কাউকে দেখি নাই। তার সঙ্গে কথাবার্ত্তায় জানলাম, সে একখানি জাহাজে রান্নার কাজ করে। জাহাজখানা আসতে দেরী হচ্ছে, এরই মধ্যে তার খরচের টাকা ফুরিয়ে গেছে। তার সিগারেট খাওয়ার অভ্যাস আছে; কিন্তু পয়সার অভাবে রাস্তার সিগারেট টুকরা কুড়িয়ে তাই দিয়ে সিগারেট তৈরী করে খায়। শোবার খরচ হোটেলে দৈনিক এক শিলিং এর কমে হয় না, তার অভাবে সে গত দুই রাত্রি রাস্তায় ঘুরে কাটিয়েছে। আমি বললাম, এই হোটেলে এত লোক বাস করছে, তুমি তোমার এই অভাবের কথা কাউকে বল নাই কি? সে বলল - "এদেশবাসী ইংরেজদের কাছে বলতে লজ্জা করে।" আমি সে রাত্রির শোবার জন্য এক শিলিং এর একটা টিকিট করে তাকে দিলাম। দু'দিন পরে তাকে আর একটি যুবকের সঙ্গে মিলে এক খানা রুটীমাত্র দু'জনে খেতে দেখে সেদিন জানলাম, সে যে নূতন বন্ধুটি পেয়েছে, তারও পয়সার অভাব, তাই দুজনেই পরস্পরের দুঃখের দরদী হয়েছে। আমি সেদিন তাদের সম্মতি নিয়ে তাদিগকে চারিটি শিলিং দিলাম। তারা আমার ঠিকানা চাইল, আমি বললাম, এটা ধার দেওয়া নয় - শোধ করবার জন্যে ঠিকানার প্রয়োজন হবে না। এই যে বিদেশে এসে এত অর্থাভাবের মধ্যে পড়েছে তবু এদের কারও প্রাণে একটুও ভাবনা চিন্তার লক্ষণ দেখলাম না; বিদেশে এসে এদের মত মানুষ দেখে আমারও মনের বল একটু বেড়ে গেল।

•

কয়েকটি লোককে নিয়ে একটি Group ফটো তুলবার মন করে তাদিগকে বলেছিলাম - তোমরা মাত্র এক শিলিং করে দিলেই প্রত্যেকে একখানি করে ফটো পাবে। ঐ ফটোর জন্য কিছু বেশী খরচ হয়েছিল বলে পরে তাদিগকে বলেছিলাম, প্রত্যেকে দুই শিলিং করে দিলে ঠিক হয়। তখন তাদের মধ্যের একটি বালিকা আমাকে বলল, "বৃটেনের ভূমিতে দাঁড়িয়ে তুমি একমুখে দুই কথা বলতে পারবে না।" আমি লজ্জিত হয়ে আমার কথাটা ফিরিয়ে নিলাম।

•

এডিনবরায় একটি মিশনারী সভায় একদিনকার বিষয় ছিল "চীনদেশে স্কটিস্ মিশনের কার্য্য।" একটি বৃদ্ধা ধর্ম্ম-প্রচারিকা তাঁদের সম্প্রদায়ের তরফ থেকে চীনদেশে যে যে কার্য্য করেছেন, ম্যাজিক লণ্ঠনের সাহায্যে তাই বক্তৃতা করে শোনাচ্ছিলেন। চীনে তাঁদের ধর্ম্মপ্রচার কার্য্যের যা বর্ণনা করলেন - তাতে বাস্তবিকই তিনি অত্যন্ত প্রশংসা পাবার যোগ্যা। সভাভঙ্গের অব্যবহিত পূর্ব্বে একজন বক্তার মুখে শোনা গেল, ম্যাজিক লণ্ঠনের ঐ সুন্দর ছবিগুলি সমস্তই ঐ বক্তৃতাকারিণী মহিলার নিজ হাতের আঁকা। তাঁর বক্তৃতার মধ্যে কিন্তু তিনি তা ঘূণাক্ষরেও প্রকাশ করতে প্রয়াস পান নাই। মহৎ চরিত্রের পরিচয় নয় কি?

•

বার্ম্মিংহামের বাইরে এক পল্লীতে রবিবারে বেড়াতে গিয়েছি। ফেরবার সময় ট্রামের অপেক্ষায় অনেকক্ষণ দাঁড়িয়েছিলাম। দু'টি মেয়ে দেখলাম, সান্-ডে স্কুল (রবিবারের ধর্ম্মশিক্ষার স্কুল) থেকে ফিরছে। আমার ট্রাম আসতে দেরী হচ্ছিল তাই তাদের ধর্ম্মশিক্ষা প্রণালী সম্বন্ধে কিছু কিছু শুনছিলাম। ট্রাম আসতেই উঠলাম, পাড়াগাঁয়ের ট্রাম, দু' একজন লোক মাত্র ছিল। আমি একটু ফাঁকা জায়গায় গিয়ে বসতেই একটি ভদ্রমহিলা ট্রামে উঠে ঠিক আমারই পাশে বসলেন। তিনি আমাকে বললেন, মেয়েদের সঙ্গে আপনার আলোচনা আমি দাঁড়িয়ে শুনছিলাম, তাতে আমি বড় খুসী হয়েছি। তারপর তিনি আমাদের ধর্ম্মপ্রণালী সম্বন্ধে অনেক কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন; নিজেও কিছু ধর্ম্মকথা কইলেন। তারপর অত্যন্ত নূতন কথা এই যে, বার্ম্মিংহামে আমার ফিরবার টিকিট একটা নয় আনা দিয়ে আমার জন্যে কিনে দিলেন, আর তাঁর নিজের জন্যে নিলেন এক আনার একখানি টিকেট। আমি ধর্ম্মপ্রাণ মহিলার দান প্রত্যাখ্যান করলাম না। আমার সঙ্গে ধর্ম্মালোচনার একটু সুযোগ নেবার জন্যেই তিনি ট্রামে চেপেছিলেন, তারপর ফিরে গেলেন। এইখানে একটু পল্লীর প্রাণের পরিচয় পেলাম।

•

ওদেশে ট্রামের বা বাসের পয়সা কেউ ফাঁকি দিতে চেষ্টা করে না। একদিন এক পেনির পথ এসে আমার নির্দ্দিষ্ট স্থানে নামলাম, কিন্তু টিকিটওয়ালা তখন উপরে থাকায় পয়সা দিতে পারি নাই; হাতের পেনিটি হাতে করেই নামতে হল, কিন্তু পেনিটি আমি পকেটে ফেলতে পারলাম না, পথের একটি বালককে দিলাম। আমাদের এদেশে কিন্তু এরূপ ক্ষেত্রে পয়সাটি পকেটে ফেলতে আমাদের মনে কোন দ্বিধা হয় না। দেশ-কাল বুঝে মনের অবস্থাও এতটুকু তফাৎ হয়।

•

বার্ম্মিংহামে স্যালভেসন-আর্ম্মির বার্ষিক ধর্ম্মসভার অধিবেশনে একদিন আমাকে কিছু বলতে হয়েছিল। আমি চৈতন্যদেবের প্রচারিত বৈষ্ণব ধর্ম্মের কয়েকটি বিষয় আলোচনা করেছিলাম - যা খ্রীষ্টধর্মাবলম্বীদের পক্ষে অনুকূল অথচ নূতন। সভাপতি মহাশয় আমার বক্তৃতা সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে বললেন, তা হবেই ত - আমাদের স্যালভেসন আর্ম্মির প্রতিষ্ঠাতা বুথ সাহেব ভারতে গিয়ে ধর্ম্ম প্রচার করেছিলেন, তারই একটা সুফল আমরা আমাদের এই ভারতীয় বন্ধুর নিকট থেকে প্রত্যক্ষ করলাম। কি আশ্চর্য্য! চৈতন্যদেবের প্রচারিত ধর্ম্ম থেকে যে ভালটুকু পাওয়া গেল, তাকেও তাদের বুথ সাহেবের কার্য্যের ফল বলে ধরে নেওয়া হল। নিজেদের গণ্ডির বাইরে যে কিছু ভাল থাকতে পারে এ ধারণা তাদের অনেকেরই নাই।

•

রিজেন্টস্ পার্কের একটি অংশে বহু কাঠবিড়াল, নানা রকমের পাখী স্বাধীন ভাবে চরে বেড়ায়। তারা মানুষ দেখে ভয় করে না, কখন কখন হাত থেকে খাবার নিয়ে খায়। মাত্র কয়েকটি নোটীশ দেওয়া আছে - 'কোন জন্তুকে কেহ বিরক্ত করিও না।' - এরই বলে জীব জন্তুরা মানুষকে ভয় করে না। দেশের আইন কানুন সাধারণে কেমন মেনে চলে, তা এ থেকেই বোঝা যায়।

•

একদিন রাস্তায় একটি মেথরকে জিজ্ঞাসা করলাম - চুল কাটাবো কোথায়? সে আমার মুখের দিকে চেয়েই বুঝল যে বিদেশী; তখন সে ঝাড়ু সেখানেই ফেলে রেখে আমাকে নিয়ে তিন চার মিনিটের পথ দূরে একটা হেয়ার-কাটার স্যালুনে উপস্থিত করে চুল কাটার বন্দোবস্ত করে দিয়ে আনন্দে হাসতে হাসতে বিদায় হল। মেথর কি আর মেথর!

•

১৯১৯ সালে ১১ই নবেম্বর বেলা এগারটার সময় গত জার্ম্মাণ মহাযুদ্ধের শান্তি স্থাপন হয়। তাই প্রতি বৎসর ঠিক ঐ দিনে ঐ সময় দু'মিনিট নিস্তব্ধ থেকে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করবার রীতি আছে। ঐ দিন দেখলাম, ঠিক লোকজন ঘরে বাইরে যে যে অবস্থায় ছিল এগারটা এগার মিনিটের সময়ে একেবারে পাথরের মত নিশ্চল হয়ে রইল। রাস্তায় গাড়ী ঘোড়া, লোকজন সবই স্থির। - বুঝলাম নিয়মানুবর্ত্তিতাই এ সব দেশকে বেশী শক্তিশালী করে তুলেছে।

•

দু'টি ভারি জিনিস নিয়ে আমাকে ট্রেণ থেকে নামতে হবে দেখে ট্রেণের একটি বারো বছরের ছেলে ধাঁ করে একটি জিনিস প্ল্যাটফর্ম্মে নামিয়ে দিয়ে ট্রেণে তার জায়গায় গিয়ে বসল। এমন অযাচিত সাহায্য ওদেশে খুবই প্রচলিত।

•

লণ্ডনে এক সময় যে গৃহস্থ বাড়ীতে থাকতাম, সেই বাড়ীর কর্ত্তার মেয়ের নিকট আমাদের বাংলার পদ্মার পোলের গুরুত্ব বর্ণন করছিলাম। পোলটি তৈরীর জন্যে জগতের অনেক বড় বড় জাতিকে জানান হয়েছিল কিন্তু সমর্থ হবে না বলে কেউ এগোয় নাই - তারপর জার্ম্মানীরা গিয়ে করে দিয়েছিল। মেয়েটি

জিজ্ঞাসা করল – ইংরেজ জাতিকে বলা হয়েছিল? আমি বললাম, হাঁ হয়েছিল। শুনে মেয়েটির মুখ ভার হয়ে গেল; সেদিন আর অন্য দিনের মত সে হেসে খেলে গল্প করতে পারল না। দেখলাম, তের বছরের মেয়েটির প্রাণও তার জাতির মান অপমানের সঙ্গে গভীর ভাবে বাঁধা।

•

ঐ পরিবারের কর্ত্তার নিকট একদিন কথাবার্ত্তায় আফ্রিকা সম্বন্ধে একটা সামান্য বিষয় তুলেছিলাম। সেই কথাটা আমাকে ভাল করে বুঝিয়ে দেবার জন্য তাঁরা তাঁদের সেই সাধারণ পরিবার থেকে রাশি রাশি বই বার করে দু' ঘন্টা পরিশ্রম করে নির্দ্দিষ্ট বিষয়টি বের করে আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। - সামান্য বিষয়টি নিয়েও যারা এত অনুসন্ধিৎসু, বড় বড় বিষয়ে তারা কত শক্তি সামর্থ্য প্রয়োগ করে!

•

আণ্ডার গ্রাউণ্ড রেলের একটা বড় ষ্টেশনে একজন সাধারণ লোককে জিজ্ঞাসা করেছিলাম – অমুক খানে যাব, কোন প্ল্যাটফর্ম্মের গাড়ীতে উঠতে হবে। সে যে প্ল্যাটফর্ম্মের কথা বলেছিল, সেখানে গিয়ে জানলাম, সে প্ল্যাটফর্ম্ম নয়। তখন একজন রেল কর্ম্মচারী আমাকে ঠিক প্ল্যাটফর্ম্মে পৌঁছিয়ে দিল। একটু পরেই দেখি পূর্ব্বের সেই ব্যক্তি ব্যস্তভাবে আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে, আমাকে পেয়েই বলল – আপনাকে ভুল সংবাদ দিয়েছিলাম, ক্ষমা করবেন। আপনাকে বলার পর আমার একটু সন্দেহ থাকায় ষ্টেশনে জেনে আপনাকে ঠিক সংবাদ দিতে খুঁজছি। কর্ত্তব্যজ্ঞান এমনই থাকা চাই বটে।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার – ভারতীয় জাতীয় গ্রন্থাগার
সাদা-কালো আলোকচিত্রগুলি শ্রীমতী অমলাশঙ্করের 'সাত সাগরের পারে' গ্রন্থ থেকে গৃহীত

[অভ্রতে কিছু কিছু বাংলা বানান টাইপের অসুবিধাটুকু বাদ দিলে মূল লেখার বানান ও বিন্যাস অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। - সম্পাদক]

কেমন লাগল : - select -
মত দিয়েছেন :
গড় : 0.00

Like Be the first of your friends to like this.

tell a Friend

আপনার মন্তব্য জানাতে ক্লিক করুন

To view this site correctly, please click here to download the Bangla Font and copy it to your c:\windows\Fonts directory.

For any queries/complaints, please contact admin@amaderchhuti.com
© 2011 - AmaderChhuti.com • Web Design: Madhuwanti Basu
Best viewed in FF or IE at a resolution of 1024x768 or higher

নিরালা গ্রাম পানতুমাই

এ.এস.এম. জিয়াউল হক

~ পানতুমাই-এর তথ্য ~ পানতুমাই-এর আরো ছবি ~

সিলেট জেলার পশ্চিম জাফলং ইউনিয়ন-এর পানতুমাইকে বলা হয় বাংলাদেশের সবচেয়ে সুন্দর গ্রাম। ভারত এবং বাংলাদেশের সীমান্তের নিভৃত কোলে মেঘালয় পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত এই গ্রামটি। আটচল্লিশটি গ্রাম নিয়ে এই পশ্চিম জাফলং ইউনিয়ন গঠিত এবং প্রায় ৬৯,০০০ মানুষ এই ইউনিয়ন-এ বাস করেন। অনেকে এই গ্রামের নাম "পাংথুমাই" বলেন, কিন্তু মতভেদে এর সঠিক উচ্চারণ "পানতুমাই"।

"ভবঘুরে বাঙালি"-র পক্ষ থেকে ছ'জনের একটি দলে আমরা তিরিশে এপ্রিল রাতের ট্রেনে রওনা দিয়েছিলাম সিলেট এর উদ্দেশে। ভোর সাড়ে পাঁচটা নাগাদ নামলাম সিলেট রেলওয়ে স্টেশনে। একটা হোটেলে সকালের নাস্তা সেরে পায়ে পায়ে রওনা হলাম বিখ্যাত কিন ব্রিজ-এর দিকে। সেখান থেকে সিএনজি নিয়ে সোজা আম্বরখানা। আম্বরখানা থেকে আবার সিএনজি করে গোয়াইনঘাট। গোয়াইনঘাট পৌঁছে সেখান থেকে আমরা কিছু শুকনো খাবার কিনলাম। দোকানে পরিচয় হল হেলাল ভাইয়ের সাথে। উনি আমাদের বললেন সিএনজি নিয়ে সরাসরি পানতুমাই চেয়ারম্যানের বাড়ি চলে যেতে। আমরাও রওনা হলাম পানতুমাই এর উদ্দেশে।

পানতুমাই গ্রামে ঢোকার মুখেই আশ্চর্যসুন্দর দৃশ্য দেখে চমকে যেতে হয়। দূরের মেঘালয় পাহাড়গুলো যেন হঠাৎ চোখের সামনে চলে এল, মনে হয় হাত বাড়ালেই ধরা যাবে। পানতুমাই পৌঁছে আমরা সোজা চেয়ারম্যানের বাড়ি গেলাম। যেতে না যেতেই বৃষ্টি শুরু হোল। ব্যাকপ্যাকগুলো বারান্দায় রেখে আমরা চেয়ারম্যান সাহেবের জন্য অপেক্ষা করছিলাম। ততক্ষণে প্রায় দুপুর বারোটার কাছাকাছি বাজে। কিছুক্ষণ পর চেয়ারম্যান মোঃ ফয়জুল ইসলাম এলেন। ইনি পুরো পশ্চিম জাফলং ইউনিয়নের চেয়ারম্যান। ওনার মতো অমায়িক মানুষ আমি খুব কমই দেখেছি। এই সামান্য পরিচয়েই আমরা কেন তাঁকে আগে খবর দিয়ে আসিনি, এখন তিনি আমাদের কী দিয়ে আপ্যায়ন করবেন এই নিয়ে ভারী বিব্রত হয়ে পড়লেন। আমরা সঙ্গে করে তাঁবু আর শুকনো খাবার নিয়ে এসেছি। কিন্তু তাঁকে কিছুতেই এটা বোঝাতে পারলাম না যে শুধু তাঁর সাথে দেখা করতেই এসেছি, আশ্রয়ের জন্য নয়। তিনি সঙ্গে স্থানীয় সেলিম ভাইকে দিয়ে দিলেন যাতে আমরা "ইন্ডিয়ান ঝরনা" দেখতে পারি। ব্যাকপ্যাকগুলো চেয়ারম্যানের বাড়িতে রেখে রওনা দিলাম ঝরনার দিকে। এই ঝরনাটিকে স্থানীয় ভাষায় ফাটাছড়ির ঝরনা বা বড়হিল ঝরনাও বলা হয়। যদিও ঝরনাটি ভারতের ভিতরে পড়েছে, কিন্তু পিয়াইন নদীর পাড়ে দাঁড়ালে একে খুব কাছ থেকে দেখা যায়। ঝরনার পাশেই রয়েছে বিএসএফ এর ক্যাম্প। বড় গাছের সারি দিয়ে এখানে দুই দেশের সীমানা নির্ধারণ করা হয়েছে।

যাই হোক, ঝরনার ঠাণ্ডা পানিতে আর বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে পিয়াইন নদীতে আমরা গোসল করলাম। এরপর বের হলাম দুপুরের খাবারের খোঁজে। বেড়ানোর জায়গা নয় বলে পানতুমাই গ্রামে কোন খাবার হোটেল বা থাকার ব্যবস্থা নেই। স্থানীয় বাজার প্রায় এক দেড় কিমি দূরে। উপায় না দেখে নদী পার হয়ে আমরা চলে গেলাম হাজিপুর বাজারে। আরেকটি বাজার আছে - মাতুরতল বাজার। কিন্তু সেটা বিপরীত দিকে এবং অপেক্ষাকৃত দূরে। যাওয়ার পথে আমরা পাহাড়ের কোলে আরেকটি ঝরনার শব্দ শুনতে পেলাম। কিন্তু ঘন জঙ্গল আর খিদের তাগিদে ওদিকে আর গেলাম না। হাজিপুর বাজারে আমরা খেলাম সেখানকার এক মাত্র খাবার এক ধরনের ভাত, ভাজি আর সাথে পিঁয়াজি এবং ছোলা। খাওয়ার শেষে আমরা আবার হাঁটতে থাকলাম গ্রামের উদ্দেশে। এক জায়গায় দেখলাম মাঠে কয়েকজন ক্রিকেট খেলছে। পাহাড়ের কোলে এত সুন্দর একটা মাঠে খেলার লোভ আর সামলাতে পারলাম না। ছেলেগুলোও আমাদেরকে আপন করে নিল এবং খেলা শেষে বারবার বলতে লাগলো, আমরা যেন আবার পানতুমাই আসি।

সন্ধ্যার সময় আমরা আবার চেয়ারম্যানের বাড়িতে ফিরে এলাম। ইচ্ছা ছিল এখান থেকে ব্যাকপ্যাকগুলো নিয়ে ঝরনার আশপাশে কোথাও তাঁবু ফেলব। কিন্তু আকাশের পরিস্থিতি এবং রাতে আমাদের নিরাপত্তার জন্য চেয়ারম্যান সাহেব সেটা করতে দিলেন না। রাতে তাঁর বাসাতেই আমাদের থাকার ব্যবস্থা করলেন। আমরাও বৃষ্টির অবস্থা দেখে আর না করিনি। রাতে সেখানেই খাওয়াদাওয়া করে ঘুমিয়ে পড়লাম।

বড়হিল ঝরনা

সকালে ন'টার ভিতরে আমরা চা খেয়ে ব্যাকপ্যাক গুছিয়ে ফেললাম। আমাদের প্ল্যান বিছনাকান্দি হয়ে সিলেট ফেরার। চেয়ারম্যান সাহেব এর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বের হতেই সেলিম ভাই জিজ্ঞাসা করলেন, আমরা পাটুয়া বর্ডার যেতে চাই কিনা? আমরাতো এক কথায় রাজি। যাওয়ার পথে আগেরদিন যে ঝরনার শব্দ শুনেছিলাম, ওটার উৎসের সন্ধানে জঙ্গলের দিকে এগোলাম। এর মাঝে আবার বৃষ্টি শুরু হোল। বাঁশঝাড় আর জঙ্গল পেরিয়ে এমন একটা জায়গায় পৌঁছলাম যেখান থেকে ঝরনার মোটামুটি একটা ভিউ পাওয়া যায়। স্থানীয়রা একে "ফেরেডের ঝরনা" বলে। যে খাসিয়া সরদারের মালিকানাধীন মেঘালয়ের এই স্থানটি, তাঁর নাম ফেরেড। বড় বড় পাহাড়ি জোঁক উপেক্ষা করে আমরা ঝরনার ছবি তুলে ফিরতি পথ ধরলাম।

বৃষ্টি মাথায় নিয়েই আমরা পাটুয়া সীমান্ত ঘুরে নিলাম। এরপর পাটুয়া থেকে আমাদের ট্রেকিং শুরু হোল বিছনাকান্দির দিকে। মেঘালয়ের এই রেঞ্জে ভারতের কিছু ঝরনা আছে যেগুলো বর্ষার সময় বেশ ফুলে ফেঁপে উঠে। পাটুয়া থেকেই সেলিম ভাইও বিদায় নিলেন। আমরাও পানতুমাইকে বিদায় জানিয়ে মেঘালয়ের সারি সারি পাহাড়কে ডান পাশে রেখে নদীর পাড় ধরে গ্রামের মাটির রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে চলে এলাম সোনার হাট। বিজিবি ক্যাম্প-এর ডান পাশের রাস্তা ধরে এগিয়ে চললাম। অপূর্ব প্রাকৃতিক পরিবেশ - একপাশে পাহাড় আর অন্যপাশে নদী। তীর ধরে হাঁটতে ভালই লাগছিল। কখনও বৃষ্টি আবার কখনওবা রোদ। আনুমানিক ঘণ্টা তিনেক হাঁটার পর পৌঁছলাম ইসলামাবাদ বলে একটা জায়গায়। এখানে নৌকা করে নদী পার হতে হবে। হঠাৎ ডান দিকে তাকাতেই একেবারে বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে গেলাম। বিস্তীর্ণ মাঠের শেষে পাহাড়ের সারি এবং মেঘের মিশ্রণ দেখে ভুলে গেলাম এটা আদৌ বাংলাদেশের কোন জায়গা। এই অসাধারণ ক্যাম্প স্পটে তাঁবু টাঙানোর লোভ অনেক কষ্টে সংবরণ করতে হোল। একেতো বৃষ্টি নামলে আশপাশে কোন আশ্রয় নেই আর অরণ্যের পরদিন জরুরি কাজও ছিল।

বিছনাকান্দি

আবার ফিরে আসব, মনে মনে এই সান্ত্বনা নিয়ে নদী পার হয়ে হাঁটতে শুরু করলাম। ডান দিকে পাহাড়ের সারিতে চোখ রেখে হাঁটছিলাম। হঠাৎ পাতার ফাঁক দিয়ে দেখি পাহাড়ের কোলে বিশাল এক ঝরনা । মুগ্ধ হয়ে দেখছিলাম আমরা সবাই। "জিরো লাইনের ঝরনা"-র সেই বিশাল জলধারা পাহাড়ের কোলে রীতিমতো গর্জন করে নীচে নেমে আসছে। ছবি তুলে ফের হাঁটতে শুরু করলাম। কিছুদূর যাওয়ার পর দেখি বিস্তীর্ণ মাঠের শেষে পাহাড়ের শুরু। মাঝে একটা ট্রেইল। আমি আর শাহিন ভাই মাটির রাস্তা ধরে হাঁটতে শুরু করলাম। বাকি চারজন মাঠের ভিতর দিয়ে আসতে লাগলো। ট্রেইল-এর এক জায়গায় আবার নদী পার হতে হবে। নদীর কিছু কিছু জায়গায় পাথর আবার কিছু কিছু জায়গা খুব গভীর। খুব সাবধানে পা ফেলে আর লাফ দিয়ে আমরা নদী পার হলাম। এখানেই পরিচয় হল শামসুদ্দিন-এর সাথে। সে সাইকেল চালিয়ে বিছনাকান্দিতে তার বাড়িতে ফিরছিল। সাইকেল থেকে নেমে আমাদের সঙ্গে হাঁটতে শুরু করল। হাঁটতে হাঁটতে শামসুদ্দিনের সঙ্গে কথা বলছিলাম। সে স্থানীয় একটা মাদ্রাসায় অষ্টম শ্রেণীতে পরে। বেড়াতে তার ভারী ভালোলাগে। পথে যেতে যেতে আরেকটা ঝরনা দেখাল শামসুদ্দিন - "দমদমার ঝরনা"। এখানে নদীর পাড়ে আমরা কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিলাম। সামনে তাকাতেই পাহাড়ের কোলে ভারতের একটা ব্রিজ দেখা গেল। ব্রিজ থেকে আরেকটু দূরে ঝাপসা ভাবে আরেকটা খুব বড় ঝরনা চোখে পড়ল। শামসুদ্দিন বলল সেই ঝরনার পাদদেশে নাকি একটি গ্রাম আছে, সেখানে সে গিয়েছে। নদীর ওপারে সীমান্তে বাংলাদেশ এবং ভারতের যৌথ উদ্যোগে তৈরি একটি বাজার আছে - "নওয়া বাজার"। সপ্তাহের নির্দিষ্ট কিছু দিনে শুধুমাত্র হাটবারে মাত্র দু'ঘণ্টার জন্য এই বাজার খোলা থাকে। আমরা এখানে আসার আধ ঘণ্টা আগেই বাজার উঠে গেছে। ব্রিজ এর নীচেই নদীর ওপারে একটা পাথর বেষ্টিত জায়গা দেখা গেল, যেখানে পানি বেশ স্বচ্ছ। ওখানে গোসল করার লোভ সামলাতে না পেরে আমরা নৌকার জন্য আশপাশে তাকাতে লাগলাম, কিন্তু কোন নৌকা আমাদেরকে ওপারে নিয়ে যাবেনা। পরে একজন স্থানীয় লোক জানালেন, একটু ঘুরপথে হেঁটে ওখানে যাওয়া যায়। আমরা সেইপথে এগিয়ে একটা জায়গায় এসে হেঁটে নদী পার হলাম। কিছুদূর এগোতেই চোখে পড়ল বিজিবি ক্যাম্প। আরো এগোতে আরেকটি ছোট বাজার। বাজারের পরেই বিস্তীর্ণ মাঠ আর মাঠের শেষে পাহাড়। আমি আর শামসুদ্দিন আগে আগে মাঠে নেমে এলাম। সামনে তাকাতেই দেখি মাঠের মাঝখানে ভারত এবং বাংলাদেশের সীমান্তসূচক তিনকোণা লোহার পিলার। এমন সময় ফাহিম এসে বলল যে সবাই বাজারে অপেক্ষা করছে, আমি ফিরলেই সিলেটের উদ্দেশে রওনা হবে। মনটাই খারাপ হয়ে গেলো, যে উদ্দেশ্যে এখানে আসা, সেই নদীতেই আর নামা হল না।

বিছনাকান্দি বাজার থেকে আমরা হাদারপাড়-এর উদ্দেশে হাঁটতে শুরু করলাম। হাদারপাড় থেকে সিএনজি যায় সিলেটে। পথে শামসুদ্দিনের বাড়ি। এইটুকু আলাপেই বড় আপন হয়ে গিয়েছিল সে। নাস্তা খাওয়ার জন্য তাকে কিছু টাকা দিতে চাইলে কিছুতেই নিল না। আবার আসলে দেখা করবো এই প্রতিজ্ঞা করে তার কাছ থেকে বিদায় নিলাম।

হাদারপাড় যাওয়ার পথে একটি নদী পড়ে। নৌকায় পার হয়ে আমরা নদীর তীরে পাহাড়ের ঠাণ্ডা পানিতে গোসল করলাম। তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। আকাশে মেঘ জমেছে। একটু পর পরই বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। যেকোন সময় বৃষ্টি নামতে পারে। হেডলাইট জ্বালিয়ে পাহাড়ের সারি পিছনে ফেলে আমরা তাড়াতাড়ি হাঁটতে লাগলাম। হাদারপাড় বাজারে পৌঁছতেই শুরু হোল তুমুল বৃষ্টি। এর ভিতরে একটি লেগুনা দেখে তাতে উঠে পড়লাম। কিন্তু ঝড় না থামলে সেটা যাবে না, রাস্তা খুব খারাপ। বৃষ্টি একটু কমলে লেগুনা ছাড়ল। বৃষ্টির ভিতর ভিজতে ভিজতে পাহাড়ের সারি পিছনে ফেলে ভাঙ্গা রাস্তায় আমাদের গাড়ি এগিয়ে চলল। কিছুদূর যেতে না যেতেই গাড়ি খারাপ হয়ে গেলো। যাইহোক ড্রাইভার একটা সিএনজি ঠিক করে দিলো, যেটা সালুটিকর পর্যন্ত যাবে। যাওয়ার পথে ড্রাইভার এবং ফাহিমের পাল্লা দিয়ে গাওয়া গান, আমাদের সময় কিছুটা হলেও কমিয়ে দিলো।

সালুটিকর নেমেই দেখি একটা খালি ট্রাক সিলেটের দিকে যাচ্ছে। ড্রাইভারের সঙ্গে কথা বলে উঠে পড়লাম। গান আর হইহুল্লোড়ের মাঝখানে ট্রাক থেকে নামলাম জিন্দাবাজার। ইতিমধ্যে, পাথরবাহী ট্রাকের ধুলোয় সবার বেশ মাখামাখি অবস্থা।

সিলেটের বিখ্যাত পানসী রেস্তোরায় রাতের খাবার খেয়েই আমরা ছুটলাম ঢাকার বাস ধরার জন্য। অবশেষে রাত সাড়ে বারোটার হানিফ পরিবহণে আমরা ঢাকায় ফিরলাম।

ইসলামাবাদ

পানতুমাই

~ পানতুমাই-এর তথ্য ~ পানতুমাই-এর আরো ছবি ~

ভ্রমণপ্রেমী জিয়াউলের স্বপ্ন সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়িয়ে প্রকৃতি আর বিভিন্ন ধরনের মানুষের জীবনের সঙ্গে পরিচিত হওয়া।

☆☆☆☆☆

কেমন লাগল : - select -

মত দিয়েছেন :

গড় : 0.00

Like Be the first of your friends to like this.

tell a Friend

আপনার মন্তব্য জানাতে ক্লিক করুন

দিনান্তভ্রমণে দিঘা

তপন পাল

~ দিঘার তথ্য ~ দিঘার আরো ছবি ~

তারিখ - ১৭ নভেম্বর ২০১৩
গন্তব্য - ব্রাইটেন অফ দি ইষ্ট - দিঘা
যাত্রাপথ - ১২৮৫৭ হাওড়া দিঘা ফ্ল্যাগ তাম্রলিপ্ত এক্সপ্রেস, কোচ-ডি-২, সিট- ৬০, জানালা। প্রত্যাবর্তন ১২৮৪৮ দিঘা ফ্ল্যাগ হাওড়া দুরন্ত এক্সপ্রেস। কোচ-সি-৩, সিট-৪৫, জানালা।
উদ্দেশ্য - চিকিৎসা, মাসে অন্তত একবার সমুদ্র না দেখলে আমি অসুস্থ হয়ে পড়ি।
সঙ্গী - একা।

বাড়ি থেকে পিঠে ব্যাগ বেঁধে রওনা সাড়ে পাঁচটায়। বাবুঘাটে রাসপূর্ণিমার পুন্যস্নানার্থীদের ভিড় ঠেলে হাওড়া নব রেল আড়ত; ঘড়িতে তখন ছ'টা দশ। আমার গাড়ি তখন ১৯ নম্বর প্ল্যাটফর্মে। ডিজেল চালিত এক ইঞ্জিন ফাঁকা কামরাগুলিকে টেনে নিয়ে এলো। তার আগায় একটি লালরঙা বিদ্যুৎ ইঞ্জিন। হাওড়া-দিঘা পুরো রেলপথই এখন বিদ্যুতায়িত।
রেল গাড়িটি খুব একটা লম্বা নয়। ইঞ্জিনের পর সাতটি সাধারণ অসংরক্ষিত কামরা, তারপর ডি ই কোচ একটি, ডি-১ থেকে ডি-২ সংরক্ষিত কামরা, সাত নম্বর আহার্য কামরা, এরপর বাতানুকূল আসনের কামরা ও আবার দুই অসংরক্ষিত কামরা - মোট আঠেরোটা। দিনের যাত্রায় বাতানুকূল কামরায় ওঠা মানে জানালার ধারে বসার আনন্দটাই মাটি। ডি-২ কামরায় নিজের আসনে বসতে গিয়ে দেখলাম তিন আসনের বেঞ্চিতে অপর দুই সওয়ারি যথেষ্ট স্বাস্থ্যবান। খুব ব্যাজার মুখে আমাকে জানলার আসন ছাড়লেও দেখলাম বেশ কোণঠাসা অবস্থা।
নেমে সংরক্ষণ তালিকায় চোখ রেখে দেখলাম ডি-৫ ও ডি-৬ কামরায় কোন যাত্রী নেই। ডি-৬ কামরায় উঠে পড়লাম। কামরার বাকী সাত সহযাত্রীর টিকিট অসংরক্ষিত যাত্রার। যাইহোক সাঁত্রাগাছি, উলুবেড়িয়া, মেচেদা, তমলুক, কাঁথি, রামনগর হয়ে সকাল দশটায় দিঘা পৌঁছলাম। ধীরেসুস্থে বেরিয়ে দেখি ততক্ষণে ভিড় কেটে গেছে, রিক্সা, অটো, গাড়ির আহ্বান স্তিমিত। দরাদরি করে একটা অ্যাম্বাস্যাডর গাড়ি আটশো টাকায় রফা হল।

পুরোনো দিঘার ভিড় ঠেলে মোহনা, পথের দুধারে সারাই-এর জন্য উলটে রাখা অজস্র নৌকা। আমার প্রথম দিঘা দর্শন ১৯৭০-এ, তদানীন্তন উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়ে, বাড়িতে না বলে; প্রবল পিতৃপিটুনির প্রগাঢ় আশঙ্কার মধ্যে দিয়ে। তখন সৈকত বরাবর হেঁটে ধীবর গ্রাম মোহনা আক্ষরিক অর্থেই ছিল এক আবিষ্কার। এখন মোহনা দিঘা যাত্রীদের অবশ্য দ্রষ্টব্যের তালিকায়। হট্টপূর্ণ মাছের বাজার ছাড়িয়ে নির্জন সৈকত বিস্তৃত। ভিজে বালি কোথাও কোথাও নরম। পা ডুবে যায়। ঢেউখেলা জল ছুঁয়ে উড়ে চলে সামুদ্রিক পক্ষীকুল, জলে ভেসে যায় অগণন ট্রলার, রঙিন পালতোলা নৌকা। সৈকতে মৃত কাঠা (Turtle)-এর খোলা। আর সদ্যমৃত স্কুইড, জেলিফিশ। নাকের গোড়ায় অগণন ফড়িং।
চোখ টানে এক ভ্রাম্যমাণ স্টুডিও। তিন চাকার সাইকেল ভ্যানের ওপর মাছ সংরক্ষণের থার্মোকলের বাক্সে ছবি প্রিন্টিং-এর বন্দোবস্ত। পর্যটকদের সবার হাতে ডি.এস.এল.আর, স্মার্ট ফোন। তবু ছাপানো দৃশ্যযোগ্য ছবির আবেদন কী অমোঘ! দেখা গেল নব প্রজন্মের বালক বালিকারা হাতে গরম ছবি পেতে উৎসুক ও তৎপর।

মোহনা ছেড়ে সরু রাস্তা ধরে দিঘা কাঁথি রোড। পুরোনো দিঘা পেরিয়ে নতুন দিঘা। এক সরাইখানায় মধ্যাহ্নভোজন। ভাত ডাল তরকারি আশি টাকা। সঙ্গে স্বর্গীয় এক থালা কাঁকড়া - দক্ষিণা তিনশো টাকা। আহারান্তে যাত্রা শুরু, সীমান্ত পেরিয়ে ওড়িশা-দিঘা জলেশ্বর রোড ধরে কিয়াগেড়িয়া-চন্দনেশ্বর পেরিয়ে বিচিত্রপুর ম্যানগ্রোভ প্ল্যানটেশন - ওড়িশা ফরেষ্ট সেক্টর ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (OFSDP)-এর উদ্যোগে ম্যানগ্রোভ জঙ্গল সংরক্ষণ, পুনর্নবীকরণ ও সুরক্ষা যা আজ সারা দেশের কাছে একটা দৃষ্টান্ত। বন সংরক্ষণ ও জীবিকা নির্বাহ যে পরস্পর বিরোধী দুই কার্যক্রম নয়, বরং পরিপূরক, তা মনে করিয়ে দেয় এই প্রকল্প। স্থানীয় জনগণকে যুক্ত করে জঙ্গল থেকে তাদের আয় বাড়াবার পথ করে দেওয়ায় স্থানীয় জনগণই জঙ্গল সংরক্ষণ করেন। সৈকত বরাবর সুবর্ণ দ্বীপের গা ঘেঁষা এই জঙ্গলে পক্ষীকূলের সমাহার। গোবেচারা গো বকের পাশাপাশি লিটল গ্রিন হেরন, চেষ্টনাট বিটটার্ন, গোলিয়াথ হেরন, নানা প্রজাতির পানকৌড়ি-ডার্টার, শ্যাগ, করমোনান্ট-এর অলস আনাগোনা। কিন্তু দুপুরতো আর পাখি দেখার সময় নয়। দূরবীনের মধ্যে দিয়েও রোদ চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। তদুপরি দর্শনার্থী আমি একা। সময় বিশেষে সেটাও খুব স্বস্তিকর অভিজ্ঞতা নয়। পক্ষীকূলের পাশাপাশি জীবজগতের যে শাখায় আমার কৌতুহল এসচুয়ারিন ম্যানগ্রোভের সেই সজীব সদস্যরা তখন শীতঘুমে মগ্ন। আসন্ন বর্ষায় আবার আসার প্রতিশ্রুতি দিয়ে নির্জন জঙ্গল ছাড়ি। রাস্তার দুপাশ দেখে বেশ বোঝা যায় আগে এগুলি বালিয়াড়ি ছিলো। হয়তো একটু দূরে এখনও আছে কোথাও। রাস্তার দুপাশে প্রায় এক মানুষ সমান উঁচু জমি, তাতে বনস্পতি সদৃশ ক্যাসুরিনাকুল, মধ্যে মধ্যে ডাঙ্গা জমি, পরিণামে ক্যাসুরিনার উন্মুক্ত শিকড়রাজি দৃশ্যমান।

পথে ভোগরাই নামে এক গ্রাম। দিগন্তবিস্তৃত ফাঁকা জমি, মধ্যে মধ্যে জলরেখা। মহিষকুল পুচ্ছটি উর্দ্ধে তুলে জলরেখা অতিক্রমণে সদাব্যস্ত। পুরোটাই সুবর্ণরেখা নদীর খাত - সাগরে মেশার আগে তার বিস্তৃতি বুকে কাঁপন ধরায়। যেদিকে তাকাই অগণন নৌকা। নেমে দূরবীন আর ক্যামেরা বাগাতেই ভিড় জমে গেল। জায়গাটি রাস্তার মোড়ের মত - চায়ের দোকান, সাইকেল সারাইয়ের দোকান, মোবাইল রিচার্জ...। বাসিন্দারা পর্যটক দেখতে অভ্যস্ত নন এবং তাদের যে খুব একটা পছন্দ করেন না, বোঝা গেল। একজন জিজ্ঞাসা করলেন, 'এই যে ছবি তুলছো কত করে বেচবে?' বিস্মিত হয়ে বললাম, 'বেচবো! বেচবো না তো, এমনিই।' - শুনে তিনি বিশ্বাস করেন না, তাঁরও ক্যামেরা আছে, ছবি তোলেন। কিন্তু সে ছবি বিক্রি হয় না। এদিকে বাবুরা তাদের গ্রামের ছবি তুলে 'অনেক' টাকায় বিক্রি করে এমনটিই তাঁর ও অন্যান্যদের ধারণা। বেশিক্ষণ থাকার ভরসা হয়নি, নাহলে ইচ্ছা ছিলো সুবর্ণরেখার খাতে প্যান্ট গুটিয়ে হাঁটাহাঁটির।

ভূষণ্ডেশ্বর রোড ধরে বালি পাহাড় পেরিয়ে কুন্তিরগাড়ি। যেখানে ভূষণ্ডেশ্বর, বিশ্বের সর্ববৃহৎ শিবলিঙ্গ। মন্দির চত্বরটি সুবিস্তৃত; পুন্যার্থীদের জন্য পূজা-উপকরণ বিক্রির দোকান, গাড়ি রাখার বন্দোবস্ত। জানা গেল বর্ষায় সুবর্ণরেখা ভাসায় গোটা চত্বরটি। সম্ভবত সেই কারণেই মন্দিরটি ছোট। একটি বড় পাতকুয়ার মত জায়গায় মাটির অনেক নীচে থেকে উঠে এসেছে সাড়ে বারো ফুট উঁচু ও চোদ্দ ফুট পরিধির কালো গ্রানাইটের স্বয়ম্ভু শিব। নীচে নামার জন্য ঘোরানো সিঁড়ি - শিবঠাকুরের মাথায় দুধ, ঘি, দই বেলপাতা ঢালার জন্য মই। দেওয়াল নেই। শুধু টিন দিয়ে মাথায় আচ্ছাদন। খুঁটিয়ে দেখে মনে হল মন্দিরের ছাদের কাঠামো প্রতি বছর বর্ষার পর বদলানো হয়।

দুপুরবেলায় মন্দির জনহীন। শুধু স্থানীয় পার্শ্ববর্তী গ্রাম থেকে কিছু পুণ্যার্থীর ভিড়। যতদূর মনে হলো পথের দুর্গমতার জন্য বাইরে থেকে খুব একটা লোকজন এখানে আসেন না। মন্দির সন্নিহিত অঞ্চলে গ্রানাইট পাওয়া যায় না। দূর থেকে নিয়ে আসা হলেও এত বড় ও ভারি শিবলিঙ্গ কী করে নদীবহুল দুর্গম এমন জায়গায় আনা হলো তাও এক বিস্ময়। সুবর্ণরেখার বানভাসি জলে বছরে ছ'মাস ওই এলাকা জলে ডুবে থাকে। সেই থেকেই জনশ্রুতির উদ্ভব - লিঙ্গ স্বয়ম্ভু - ব্রহ্মাণ্ডের আদি লিঙ্গ সুবর্ণরেখার চর জমি থেকে উত্থিত হয়েছিল। মতান্তরে হিমালয়ের কৈলাস পর্বত থেকে জলে ভেসে দেবাদিদেব মহাদেবের মর্ত্যে আগমন - যদিও এটাই ভৌগোলিক অসম্ভাব্যতা। মন্দির চত্বরে পূজা উপকরণের দোকানে দেবমাহাত্ম্য বর্ণনাকারী বাংলা পুস্তিকা উপলব্ধ। তাই পড়ে জানা গেল দেবতা অতি জাগ্রত ও ভক্তদের মনোবাঞ্ছা পূরণে উদার হস্ত। আমার তখন একটাই প্রার্থনা - ঠাকুর, দিঘা-হাওড়া দূরন্ত এক্সপ্রেস ট্রেন আমাকে না নিয়ে ছেড়ে না যায়।

এবার ফেরার পালা। গাড়িতে সটান নতুন দিঘা। ঘড়িতে তখন তিনটে দশ। দশ মিনিট সৈকতে। আইসক্রিম। গাড়ির ভাড়া মিটিয়ে ১২৮৪৮ দিঘা-হাওড়া দূরন্ত। তিনটে পঁয়ত্রিশে যাত্রা শুরু। তারপরি আহার্য। ভক্ষণান্তে এক ঘুমে হাওড়া। ঘড়িতে তখন ছটা আটান্ন - তেইশ মিনিট লেট।

~ দিঘার তথ্য ~ দিঘার আরো ছবি ~

অ্যাকাউন্টস ও ফিনান্সের দক্ষ আমলা তপন পাল বোম্বে ন্যাচারাল হিস্ট্রি সোসাইটি এবং ইন্ডিয়ান রেলওয়ে ফ্যান ক্লাবের সদস্য। ভালোবাসেন বেড়াতে আর ছবি তুলতে।

কেমন লাগল : - select -

মত দিয়েছেন :

গড় : 0.00

Like Be the first of your friends to like this.

tell a Friend

আপনার মন্তব্য জানাতে ক্লিক করুন

To view this site correctly, please click here to download the Bangla Font and copy it to your c:\windows\Fonts directory.

For any queries/complaints, please contact admin@amaderchhuti.com
© 2011 - AmaderChhuti.com • Web Design: Madhuwanti Basu
Best viewed in FF or IE at a resolution of 1024x768 or higher

ঝরনার পাড়ে তাঁবুর ফানুস

সুরাইয়া বেগম

'বলতো মানুষ কীভাবে সবচেয়ে বেশি শিখতে পারে?' - কলেজে প্রথম দিনেই স্যার এই প্রশ্নটা করেছিলেন। তিনিই আবার বলেছিলেন, 'মানুষ সবচেয়ে বেশি শিখতে পারে বই পড়ে আর ভ্রমণ করে।' স্যারের কাছে অনেক আগের শোনা সেই কথাটা কেমন করে মাথার ভেতর ঢুকে গেল তা বুঝতেও পারিনি। অল্পই বই পড়েছি কিন্তু সেভাবে কখনও ভ্রমণ করা হয়নি। কিন্তু সবসময় সুযোগ খুঁজেছি কোথায় যাওয়া যায়। অপেক্ষার ইতি টেনে দিল পিক ৬৯। তারা বান্দরবানে একটা ট্যুরের আয়োজন করছে খবরটা পেতেই এক বন্ধুর সাহায্যে যাওয়ার সব বন্দোবস্ত করে ফেললাম। যত সময় ঘনিয়ে আসছিলো আমার মন তত বেশি উত্তেজিত হয়ে উঠছিল। জীবনের প্রথম ভ্রমণ বলে কথা!

তারিখটা ছিল ১৩, বুধবার। সেদিন রাতেই আমরা রওয়ানা দেব। সেদিন ছিল আরেকটা বিশেষ দিনও - বিশিষ্ট ঔপন্যাসিক হুমায়ূন আহমেদের জন্মদিন। এটাই তাঁর মৃত্যুর পরের প্রথম জন্মদিন। সারাদিন গোছানোর ফাঁকে ফাঁকে তাঁর নানান লেখার কথা মনে পড়ছিল বারবার, টিভির নানা অনুষ্ঠানেও মাঝেমধ্যে চোখ রাখছিলাম। জামাকাপড় গুছিয়ে সন্ধ্যা ৭টার দিকে বাসা থেকে বের হলাম। প্রথম গন্তব্য আজিজ মার্কেটে পিক ৬৯-এর অফিসে। সেখানে দুজন অপরিচিত মানুষের সঙ্গে আলাপ হল। একজন মানিক ভাই আর অন্যজন ফারজানা আপু। সেখান থেকে আমরা চলে এলাম বাস স্ট্যান্ডে। আস্তে আস্তে সবাই এসে জড়ো হতে লাগলো। আমরা মেয়ে ছিলাম পাঁচ জন। আমি আর ফারজানা আপু ছাড়া টুম্পা আপু, ফারিহা আপু আর সাদিয়া আপু। সবার সাথেই ধীরে ধীরে পরিচয় হয়ে গেল। বাস ছাড়ল রাত ১০:৩০ টায়। যে যার পছন্দমত জায়গায় বসে পড়ল। শুরু হল আমার জীবনের এতকালের কল্পিত ভ্রমণের বাস্তব রূপ।

রাস্তায় বিশাল জ্যাম আর তাই বাস মোটামুটি ঠেলা গাড়ির মত চলা শুরু করল। আমাদের বাসের ড্রাইভার আবার সদ্য সুদূর আরব দেশ থেকে ড্রাইভিং করে এসেছেন, তাই কিছুক্ষণ পরপর শুধু মরুভূমির দিকে বাস নামিয়ে দিচ্ছিলেন অর্থাৎ সোজা রাস্তায় না গিয়ে বারবার রাস্তার পাশের খোলা জায়গায় নেমে যাচ্ছিলেন। ঝাঁকুনির চোটে আমার চিন্তা হচ্ছিল হাড্ডিগুলো জোড়া লাগানোর জন্য আমাদের আবার কুমিল্লার মগবাড়িতে থেকে যেতে হবে না তো! যাইহোক তিনটের সময় কুমিল্লায় ধানসিঁড়ি হোটেলে রাতের খাওয়া সেরে আবার বাসে উঠলাম। বাস চলল রাতের আধাঁর পেরিয়ে ভোরের দিকে।

আমাদের বাস ভ্রমণ শেষ হলো আঠেরো ঘন্টায়। ড্রাইভার আমাদের নিয়ে লোফালুফি খেলতে খেলতে পরের দিন বিকেল ৪:৩০টেয় নিক্ষেপ করলেন কেরানির হাটে। সেখানে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন জুমন ভাইয়া। উনি আগেই আমাদের খাবারের বন্দোবস্ত করে রেখেছিলেন। দুপুরের খাওয়া শেষ করে আমরা বান্দরবান যাওয়ার জন্য মহেন্দ্র নামে গাড়িতে উঠলাম। এগুলো দেখতে সিএনজির মতো কিন্তু সিএনজিও না আবার টেম্পোও না। আমি, টুম্পা আপু, শরীফ (গাইড) এবং লিমন ভাইয়া একটায় উঠে বসলাম।

সন্ধ্যা ছ'টার দিকে বান্দরবান শহরের দিকে রওয়ানা দিয়েছিলাম। রাস্তার দুপাশে আবছা আবছা আলো পড়ে হঠাৎ হঠাৎ একঝলক দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল ছোট বড় পাহাড়। এটাও একটা মজার জিনিস। পুরো দেখা যাচ্ছেনা বলেই যেন মনের ভিতর এর একটা ইচ্ছেমতো প্রতিকৃতি আঁকতে পারছিলাম। মাঝে মাঝে জোনাকির ঝাঁক। আমাদের গাড়ির আলো পড়লে বোঝা যায় না। কিন্তু দূর থেকে দেখে মজা পাচ্ছি। এখন আর দিনে না আসতে পারার আক্ষেপটা নেই। জোনাকির আলোয় বিলীন হয়ে গেল সকল ক্লান্তি। এ এক অন্যরকম অনুভূতি। বুকের ভিতর কোথায় যেন ছুঁয়ে যায়।

আমরা বান্দরবান শহরে এসে পৌঁছালাম সন্ধ্যে ৭টায়। রাতে থাকব সুমাইয়া নামে একটা হোটেলে। হোটেলের পাশে একটা বড় ব্রিজ আছে। আমরা সংখ্যায় তেরো হওয়ায় পাঁচটা রুম নেওয়া হল। প্রতিটা রুম বড় এবং সবাই মোটামুটি আরামেই থাকতে পারবে। আমরা ফ্রেশ হয়ে বেরিয়ে ব্রিজটার ওপর কিছুক্ষণ আড্ডা দিলাম। আড্ডা শেষে রাতের খাওয়া হল।

৮:৩০-র দিকে আমরা ট্রেকিং শুরু করলাম। লক্ষ্য পাইখংপাড়া। ঝিরি ধরে হাঁটতে লাগলাম। ছোট বড় পাথর ডিঙিয়ে যাচ্ছি। মাঝে মাঝে ছবি তোলা হচ্ছে। বেশ অনেকটা এগিয়ে পনেরো মিনিটের একটা ব্রেক নিলাম। এমন করে মোটামুটি তিন চারটে ব্রেক নিয়ে আমরা দুপুর দুটোয় পৌঁছলাম পাইখংপাড়ায়। এখানে আমরা পিটার দাদার ঘরে জিনিসপত্র রেখে ঝরনা দেখার জন্য বেরিয়ে পড়লাম। দু-তিনজন থেকে গেল রান্না-বান্নার জন্য। মোটামুটি আধ ঘণ্টা হাঁটার পর ঝরনার সন্ধান পেলাম। সঙ্গে সঙ্গে সবার মনেও যেন খুশির ঝরনা বইতে শুরু করল। আমি জীবনে প্রথম ঝরনা দেখলাম। উত্তেজনায় চোখে পানি চলে এল। তা গোপন করে সবার সঙ্গে খুশিতে আবার উচ্ছ্বল হয়ে উঠলাম। এই সুন্দর দৃশ্য দেখে ততক্ষণে সবাই সারা দিনের হাঁটার কষ্টটা ভুলে গেছি।

দুপুরের খাওয়া সেরে রওনা দিলাম ক্যাম্প সাইডের দিকে। আমাদের সঙ্গে স্থানীয় তিনজন পথপ্রদর্শক রয়েছেন আর আমাদের পিটারদা। সবচেয়ে মজার বিষয় হল তাঁদের কাছে একটা প্রাগৈতিহাসিক বন্দুকও ছিল। যেটা দিয়ে তাঁরা সচরাচর শিকার করেন! সবাই এগিয়ে যাচ্ছে, এদিকে আমি, টুম্পা আপু, রাব্বি ভাই, লিমন ভাই, জুমন ভাই আর শরীফ পেছনে পড়ে গেছি। এরমধ্যেই আবার রাস্তা ভুল করে অন্য পথে অনেকখানি এগিয়েও গেছি। অনভ্যস্ত পায়ে হাঁটতে হাঁটতে আমার আর টুম্পা আপুর জান যায় যায় আর কী। তবু অন্যদের কথা ভেবে প্রায় নীরবেই সহ্য করছি একটুআধটু উঃ আঃ ছাড়া। যাইহোক শেষপর্যন্ত ঠিকপথে ফিরতে পারলাম। দেখি আমাদের দুই বন্দুকধারী পাহারাদার উদ্বিগ্ন চিত্তে অধীর আগ্রহে পথপানে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। হাঁফ ছেড়ে একগাল হেসে বললেন, ইতিমধ্যেই তাঁরা আমাদের খোঁজে আবার পাইখংপাড়া থেকে ঘুরে আসছেন। আমি তো শুনে গোপনে একবার ভাল করে তাদের আপাদমস্তক দেখে নিলাম। এটা কী করে সম্ভব! আমাদেরতো একবার আসতেই এই কাহিল অবস্থা। বাকীরাও আমাদের জন্য চিন্তিত হয়ে পড়েছিল। এবারে সিদ্ধান্ত নেওয়া হল যে সবাই মোটামুটি কাছাকাছি থাকবে আর স্থানীয় একজন সামনে দু'জন মাঝখানে এবং একজন পেছনে। অর্থাৎ কীনা আমাদের বেঁধে ফেলা হল অদৃশ্য দড়ি দিয়ে।

অবশেষে আমরা ক্যাম্প সাইডে এসে পৌঁছালাম। এখানে ঘটল আরেক ট্রাজেডি। রিচার্ড ভাইয়া নামতে গিয়ে পাথরে পা পিছলে আছাড় খেল এবং তাকে ধরতে গিয়ে আরেকটা আছাড় খেল ফারিহা আপুও। আমি তাদের সামনেই ছিলাম। মনে মনে ভাবছি কী বাঁচাটাইনা বেঁচে গেলাম কারণ আমাকে ধরার জন্য কেউতো ওখানে ছিল না।

রাতটা বেশ মজার ছিল। এমন দৃশ্য না দেখে মরে গেলে হয়তো আফসোসই থেকে যেত। এখন বুঝতে পারছি মানুষ কেন সুন্দর কিছু সময়ের কথা মনে করে বেঁচে থাকতে চায়। আমি যদি কখনও আমার জীবনের সুন্দর দু-একটা দিনের কথা মনে করি তাহলে প্রথমে এই দিনটির কথাই মনে পড়বে। ক্যাম্প সাইডে এসে সবাই বসে পড়লাম। এমন সময় রাব্বি ভাই বলল যে, আমরাই প্রথম ট্যুরিষ্ট যারা এই সুন্দর জায়গাটাতে ক্যাম্প করছি। এটাও আরেকটা মজা। রাতে মুরগীর বারবিকিউ হবে। সবাই বারবিকিউ করার আয়োজনে নেমে গেল। কেউ কেউ তাঁবু টাঙানো শুরু করলো। আর স্থানীয় সঙ্গীরা আগুন জ্বালিয়ে দিল। সবাই যে যার মত ব্যস্ত, এরি মধ্যে আমাদের সবজান্তা সাদিয়া আপু কবিতা লিখতে বসে গেলেন। আবার ওনার কবিতাটি আমরা কেউ দেখার আগেই তিনি সেটার সলিল সমাধি রচনা করে ফেললেন আগুনে পুড়িয়ে! আহা আফসোস, যদি একটু দেখতে পেতাম! তাঁবুগুলো টাঙানো হলে একটা অদ্ভুত মায়াবী পরিবেশের সৃষ্টি হল। তাঁবুগুলোর ভেতরে আলোর আভায় মনে হচ্ছিল সেগুলো যেন একেকটা ফানুস। পানির ওপর পাথর, তার ওপর তাঁবুর ফানুস। মনোমুগ্ধকর একটা দৃশ্য।

খুব সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখি স্থানীয় একজন বসে আছেন। ওনাকে জিজ্ঞাসা করলাম, ঘুমান নি? উত্তরে বুঝলাম বিভিন্ন তাঁবুতে সমবেত নাক ডাকার চোটে ওনার আর ঘুম হয়নি। ভাগ্যিস আমি আগেভাগে শুয়ে পড়েছিলাম। আসলে দুই পাশের দুই তাঁবুতে ছিলেন লিমন ভাই ও মানিক ভাই। বাকিরাও ঘুম থেকে উঠে হাসতে হাসতে বললেন আমরাতো রাতে ওনার (মানে মানিক ভাইয়ের তাঁবু দেখিয়ে) নাক ডাকা শুনে ভাবছি যে ভালুক আসছে বুঝি তাই তাড়াতাড়ি বন্দুক নিয়ে বের হলাম। বের হয়ে তো দেখলাম এই অবস্থা!

চা-বিস্কুট দিয়ে সকালের নাস্তা সেরে তাঁবু গুছিয়ে আবার রওনা দিলাম পাইখংপাড়ার উদ্দেশে। দুপুর একটায় পাইখংপাড়ায় পৌঁছে খেয়ে নিয়ে ফিরতি পথে রওনা দিলাম ট্রাকে করে। এই ট্যুরে আমার সব কিছুই নতুন তাই ট্রাক জার্নিটাও নতুন। ট্রাকে ওঠার পর মনে হল ঢাকায় হয়তো এযাত্রা আর ফিরে যেতে পারব না। এতো সেই বাস ড্রাইভারের চেয়েও এক ডিগ্রি বেশি। ট্রাক আমাদেরকে একবার ওপরে তোলে আবার ছেড়ে দেয়। ফুটবলের মতো লাফাতে লাফাতে খালি মনে হচ্ছিল বোধহয় এই ট্রাকিং এর থেকে ট্রেকিং-ই ভাল ছিল! ট্রাকে আমাদের দু-একজন অসুস্থও হয়ে পড়ল। কিন্তু এত ঝামেলার মধ্যেও মানিক ভাই হাসতে হাসতে আর হাসাতে হাসাতে চললেন। সত্যি ক্ষমতা আছে!

ট্রাক থেকে নেমে আবার ট্রেনে রওনা ঢাকার দিকে। ভালোয়মন্দয় আমার প্রথম ভ্রমণ শেষ। এবারে আবার কবে বেরিয়ে পড়ব তার চিন্তা শুরু হল।

'দ্য পিপলস্ ইউনিভার্সিটি অফ বাংলাদেশ' নামে একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি সাহিত্য নিয়ে অনার্স পড়ছেন সুরাইয়া। ভালোবাসেন বই পড়তে, চলচ্চিত্র দেখতে, কবিতা লিখতে, ভ্রমণ করতে। তিনি কিছু ভ্রমণ কাহিনি অনুবাদও করেছেন।

কেমন লাগল : - select -

মত দিয়েছেন :

গড় : 0.00

Like Be the first of your friends to like this.

tell a Friend

তিন সাগরের মিলনস্থল - কন্যাকুমারী

অদিতি ভট্টাচার্য্য

কন্যাকুমারীর তথ্য || কন্যাকুমারীর আরো ছবি

কন্যাকুমারী। ভারতের মূল ভূখণ্ডের একেবারে দক্ষিণতম প্রান্ত। ছোটোবেলায় কতদিন ভারতের মানচিত্রর সামনে দাঁড়িয়ে ভেবেছি কবে যাব ওইখানে, ওই প্রান্তে যেখানে বঙ্গোপসাগর, ভারত মহাসাগর আর আরব সাগর মিলে মিশে একাকার। অবশেষে সুযোগ হল, কেরালা ভ্রমণের সঙ্গে জোড়া হল কন্যাকুমারীকেও।

কোভালম থেকে এক সকালে রওনা দিলাম কন্যাকুমারীর উদ্দেশ্যে। যাওয়ার পথে দেখলাম পদ্মনাভপুরম প্যালেস। ষোড়শ শতাব্দীতে নির্মিত কাঠের এই প্রাসাদটি কেরালার প্রাচীন স্থাপত্য রীতির এক অনবদ্য নিদর্শন। এই প্রাসাদের বিভিন্ন অংশ আছে - মন্ত্রশালা অর্থাৎ রাজার মন্ত্রণালয়, থাই কোট্টারাম অর্থাৎ রাজার মার বাসস্থান, নাটকশালা ইত্যাদি। প্রাসাদের অভ্যন্তরে বহু পুরোনো কাঠের নানা রকম আসবাবপত্র রয়েছে। সিলিং এবং থামের কাঠের নকশা এক কথায় অসাধারণ। এক জায়গায় সিলিং-এ নব্বইটি বিভিন্ন ডিজাইনের ফুল রয়েছে, সবই কাঠের। প্রাসাদটি ঘুরে দেখতে যথেষ্ট সময় লাগে। প্রাসাদের লাগোয়া মিউজিয়াম। প্রাসাদের মাথায় একটি তিনশ বছরের পুরোনো ঘড়ি আছে যা এখনও সঠিক সময় দিয়ে চলেছে।

ওখান থেকে সোজা কন্যাকুমারী। হোটেলে জিনিসপত্র রেখে, খাওয়া দাওয়া করেই সমুদ্রের ধারে চলে এলাম। তীর থেকে আধ কিলোমিটার মতো দূরে সমুদ্রের জলের মধ্যে মাথা তুলে আছে একটি প্রস্তরখণ্ড। প্রাচীন কাল থেকেই এটি প্রসিদ্ধ শ্রীপদ পারাই নামে। পুরাণ অনুসারে দেবী কুমারী এখানে তপস্যা করেছিলেন। তাঁর পাদস্পর্শে ধন্য হয়েছিল এই প্রস্তর। পাথরের একটি অংশ লম্বাটে, বাইরে বেরোন, অনেকটা মানুষের পায়ের মতো দেখতে। এটিকেই দেবীর পা বলে মনে করা হয়। তামিল ভাষায় পারাই মানে পাথর।

তিন বছর ধরে সারা ভারতের আনাচে কানাচে ঘুরে বেড়ানোর পর ১৮৯২ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষ দিকে এক বাঙালি যুবক এখানে এসেছিলেন। মনে তখন তাঁর জিজ্ঞাসার উত্তাল সমুদ্র, নিজের দেশবাসীর দুর্দশা দূর করার তীব্র আকুতি। সেই জিজ্ঞাসাকে শান্ত করতে, নিজের ভবিষ্যত পথ নির্ধারণ করতে তিনি সাঁতরে সমুদ্রের ভেতর জেগে থাকা এই পাথরে আসেন এবং তিন দিন তিন রাত এখানেই ধ্যানমগ্ন থাকেন। এরপরের ঘটনা ইতিহাস। তাঁর স্মরণেই এখানে গড়ে উঠেছে বিবেকানন্দ রক মেমোরিয়াল।

লঞ্চে করে পৌঁছতে হয় বিবেকানন্দ রকে। এ যাত্রাটাও বেশ লাগে। এর দুটি অংশ, বিবেকানন্দ মণ্ডপম এবং শ্রীপদ মণ্ডপম। বেশ অনেকগুলো সিঁড়ি ভেঙে বিবেকানন্দ মণ্ডপমে উঠতে হয়। সেখানে একটি বড়ো হলে রয়েছে স্বামী বিবেকানন্দের একটি বিশাল মূর্তি। ছবি তোলা এখানে নিষিদ্ধ। রয়েছে ধ্যানকক্ষ। মণ্ডপদুটি এমনভাবে নির্মিত যাতে স্বামী বিবেকানন্দের মুখ দেবীর পদচিহ্নের দিকেই থাকে। সুন্দর এখানকার পরিবেশ। পেছনে তাকালে ভারতের মূল ভূখণ্ড, তাছাড়া শুধুই জলরাশি। বঙ্গোপসাগর, ভারত মহাসাগর আর আরব সাগর এখানে এক। কত যে রঙের খেলা তাতে! দেখতে দেখতে বেশ সময় কেটে যায়।

বিবেকানন্দ মেমোরিয়াল রকের অনতিদূরে অপেক্ষাকৃত ছোটো এরকমই আরেকটি পাথরের ওপর আছে বিখ্যাত তামিল কবি তিরুভাল্লুভারের মূর্তি। মূর্তিটি আটত্রিশ ফিট উঁচু একটি পেডেস্টালের ওপর বসানো। সব মিলিয়ে পুরো স্থাপত্যটি একশ তেত্রিশ ফিট উঁচু। এখানেও লঞ্চে করেই যেতে হয়। সকাল আটটা থেকে বিকেল চারটে অবধি লঞ্চ চলাচল করে।

কন্যাকুমারী - যাঁর নামে দক্ষিণ ভারতের এই শহর এবং জেলার নাম, তিনি দেবী কুমারী, দেবী দুর্গার কুমারী রূপ। দুপুরে মন্দিরে যাওয়া যায় নি, তাই সন্ধের আরতির সময় গেলাম দেবী দর্শন করতে। পুরাণকথা অনুযায়ী দৈত্যরাজ বাণাসুরের অত্যাচারের হাত থেকে সবাইকে মুক্তি দিতে দেবী কুমারীর আবির্ভাব। সমুদ্রের একদম কাছেই মন্দির। জনশ্রুতি এই মন্দির তিন হাজার বছরের পুরোনো। মন্দিরের ভেতরে দেবীর বালিকা রূপের মনোরম মূর্তি। খুব সম্ভবত দেবীর কুমারী রূপের মূর্তি ভারতের এই একটি জায়গাতেই আছে। দেবীর সর্বাঙ্গে নানা মূল্যবান অলঙ্কার। তবে সবচেয়ে দৃষ্টি কাড়ে দেবীর হীরের নথ। প্রদীপের স্বল্প আলোকেও যার উজ্জ্বল দ্যুতি। শোনা যায় প্রাচীন কালে যখন মন্দিরের পূর্ব দিকের দরজা খোলা থাকত তখন সূর্যের আলোয় এই হীরের

নখের ঝলকানি দূরে সমুদ্রে নাবিকরাও নাকি দেখতে পেত। বর্তমানে এই দরজা বন্ধই রাখা হয়, কোনো বিশেষ অনুষ্ঠানের সময় কখনো সখনো খোলা হয়। দেখে ভালো লাগল যে একেবারে সামনে থেকে দর্শনের সুযোগ পাওয়া যায়।
মন্দির থেকে ফিরে সমুদ্রের ধারে বেশ কিছুক্ষণ সময় কাটালাম। দূরে বিবেকানন্দ মেমোরিয়াল রক তখন সেজে উঠেছে আলোকমালায়। অন্ধকারে সমুদ্রের বুকে যেন জ্বলজ্বল করছে। প্রকৃতি সদয় থাকলে এখানে সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্তের দৃশ্যও অতি মনোরম।

(তথ্যসূত্রঃ কেরালা পর্যটনের ওয়েবসাইট এবং উইকিপিডিয়া)

কন্যাকুমারীর তথ্য || কন্যাকুমারীর আরো ছবি

সংখ্যাতত্ত্ববিদ অদিতির কাছে বই আর অক্সিজেন সমতুল্য। কর্মসূত্রে আরব দুনিয়ায় বসবাসের অভিজ্ঞতাও আছে। ভ্রমণ,ছবি তোলা, এম্ব্রয়ডারির পাশাপাশি ইদানীং লেখালিখিতেও সমান উৎসাহী। নানান ওয়েব ম্যাগাজিন (আসমানিয়া, জয়ঢাক,পরবাস, মাধুকরী, গল্পকবিতা ডট কম) ও আরো দু একটি পত্রপত্রিকায় লেখা প্রকাশিত হয়।

☆ ☆ ☆ ☆ ☆
কেমন লাগল : - select -
মত দিয়েছেন :
গড় : 0.00

Like Be the first of your friends to like this.

tell a Friend

আপনার মন্তব্য জানাতে ক্লিক করুন

To view this site correctly, please click here to download the Bangla Font and copy it to your c:\windows\Fonts directory.

For any queries/complaints, please contact admin@amaderchhuti.com
© 2011 - AmaderChhuti.com • Web Design: Madhuwanti Basu
Best viewed in FF or IE at a resolution of 1024x768 or higher

যেখানে আকাশ নাম ধরে ডাকে

মার্জিয়া লিপি

কেদারনাথের তথ্য

স্নেহের ভোর,

বন্যাবিধ্বস্ত কেদারনাথের ছবি দেখছিলাম টেলিভিশনে। মনে পড়ছিল বছর কয়েক আগের কথা। সেবারে ভারত ভ্রমণে আমাদের গন্তব্য দেরাদুন, সিমলা, নৈনিতাল, দিল্লি। সেটা ছিল ২০০৪ সাল। সেবারে হিমালয় তীর্থযাত্রা শেষে আমি তোমাকে ধারণ করি, তোমার অস্তিত্ব অনুভব করি। আজ বারবার সেই ভ্রমণকথা মনে পড়ছিল। সেই যাত্রায় আমার সঙ্গী ছিলেন তোমার বাবা আর কলকাতার দু'জন।

তুমিতো জানো বরাবরই প্রকৃতি আমাকে খুব টানে। নদী, ঝরনা, পাহাড়, সন্ধ্যার আকাশ, আকাশ ভরা তারা, পূর্ণিমা, শরতের ভোর, শিউলি ফুল ঝরা, কাশবন - নিস্বর্গ প্রকৃতির সৌন্দর্য আমার ভিতরের শূন্যতাকে আরো শূন্য করে। আমার তখন শূন্যতায়, নিমগ্নতায় ডুবে যেতে ইচ্ছে করে।

সব মানুষই অন্যরকম। তারপরও আমি সব সময়ই খুব বেশি অন্যরকম...

তোমাকে লিখতে লিখতে শুনতে পাচ্ছি, দূর থেকে গান ভেসে আসছে - "পাহাড়ের কান্না দেখে, তোমরা তাকে ঝরনা বলো" ...

হাওড়া থেকে যাত্রা করে দুন এক্সপ্রেসে দু'দিন দু'রাত কাটানোর পর তৃতীয় দিনে সূর্য হঠাৎই বললো - 'হিমালয়ে ট্রেকিং করবে? পাহাড়ে ২৮ কিলোমিটার হাঁটতে পারবে তো?'
ট্রেকিং-এর কোন পূর্বপ্রশিক্ষণ নেই, আমার তিরিশ বছরের জীবনে তখনও পাহাড়ে হাঁটার অভিজ্ঞতা কেবল মাধবকুণ্ড আর সীতাকুণ্ডের চন্দ্রনাথ মন্দির।
ভাটি এলাকায় হওয়ার কারণে শুকনো মৌসুমে সদর জেলার বাড়ি থেকে গ্রামের বাড়ি আসা যাওয়ার জন্য কয়েক কিলোমিটার হাঁটতে হয়। কিন্তু সেটা পাহাড়ে নয় সমতলে। সেই হাঁটার অভিজ্ঞতা আর আত্মবিশ্বাসকে সম্বল করে সূর্যকে প্রশ্ন করেছিলাম - ২৮ কিলোমিটার হাঁটলে কী পাবো?
উত্তরে শুনলাম 'হিমালয়'।
কল্পনার চোখে দেখতে লাগলাম - সাদা বরফের শৃঙ্গ হিমালয় আর শেরপাদের ছবি।
এর আগে দিব্য চোখে কাঞ্চনজঙ্ঘাকে দেখেছিলাম দার্জিলিং-এ। সেখানে প্রতিষ্ঠিত তেনজিং নোরগের মাউন্টেনিয়ারিং ইনস্টিটিউট-এ গত ট্যুরে কিছুটা সময় কাটিয়েছিলাম। তখন ইচ্ছে হয়েছিল, ভেবেছিলাম, একটু আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠবো কিনা? চেষ্টা করে দেখবো নাকি, আমিও শেরপাদের মত পাহাড়ে যেতে পারি কিনা?
সূর্যের প্রস্তাবে কিছু না ভেবেই তাই ঝোঁকের মাথায় রাজি হয়ে গেলাম।
একটু দুশ্চিন্তা আর পিছুটান ছিল - কলকাতা থেকে করে নিয়ে আসা সিমলা, নৈনিতাল আর দিল্লির রিটার্ন টিকিটগুলোর ভবিষ্যৎ নিয়ে।

সামনের ষ্টেশন হরিদ্বার। ঘন্টা খানেক পর অবশেষে শিবালিক পাহাড়ের পাদদেশে হরিদ্বারে পৌঁছালাম। পুরনো পরিচয় মায়াপুরী নামে। এখান থেকেই গঙ্গার সমতলে যাত্রা শুরু হয়েছে। আমাদের গন্তব্য উত্তর প্রদেশের হিমালয় শৈবতীর্থ কেদারনাথ শৃঙ্গ।
দুপুরে হিমালয়ের ট্রেকিং-এর প্রস্তুতি হিসেবে মনসামঙ্গল পাহাড়ে চার ঘন্টার ট্রেকিং শেষ করলাম। সন্ধ্যায় 'হরি কি পউরি' ঘাটে ৯৯৯টি ফুল, প্রদীপ দিয়ে সাজানো পাতার ভেলায় মঙ্গলারতির কথা এখনও চোখের সামনে ভাসছে। হরিদ্বারে ষ্টেশনে রিটার্ন টিকিট ফেরত দেওয়ার সময় কলকাতার দাদাদের কাছে ধরা পড়লাম। পাসপোর্টে নাম দেখে বুঝে গেলেন – তাঁদের দুই তীর্থ সহযাত্রী, হিন্দু নয় মুসলিম!

ভোর পাঁচটায় রওনা হলাম শৈবতীর্থ হিমালয় শৃঙ্গের উদ্দেশে। কাঁধে হ্যাভারস্যাক, হাতে স্পাইক লাগানো লাঠি আর হঠাৎ ঝড়ের কবল থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে উইন্ডসর ।
কেদারশৃঙ্গের পাদদেশে মন্দাকিনী নদীর কূলে, গাড়োয়াল হিমালয়ে ১২৮৬৬ ফুট উঁচুতে কেদারনাথের মন্দির।
সেদিন ছিল অক্টোবর মাসের ১৯ তারিখ। দেওয়ালির পর ২৫ তারিখে মন্দিরের মূর্তিকে সমতল ভূমি উখিমঠে অধিষ্ঠিত করা হয়। তখন বরফের জন্য বন্ধ হয়ে যাবে গৌরীকুণ্ডের যোগাযোগ ব্যবস্থা।

কেদারনাথের পথে সবুজ মন্দাকিনী আর শ্বেত অলকানন্দা নদী রুদ্রপ্রয়াগে মিলিত হয়েছে। সেখানে সঙ্গমে একখণ্ড শিলা - নাম 'নারদশিলা'। কথিত আছে, এই শিলায় বসে নারদ তাঁর বীণা বাজাতেন।

কেদারনাথ যাওয়ার জন্যে হরিদ্বার থেকে তেরো ঘণ্টা বাস জার্নি করে প্রথমে পৌঁছেছি গৌরীকুণ্ডে। পার্বতী এখানকার উষ্ণ কুণ্ডে স্নান করতেন, তাই এ জায়গার নামকরণ গৌরীকুণ্ড। শৈবতীর্থ কেদারনাথ শৃঙ্গ সেখান থেকে ২৮ কি. মি. আসা যাওয়া, ট্রেক বা পায়ে হাঁটার পথ। যদিও হেলিকপ্টার, ঘোড়া, ডান্ডি - অনেক কিছুর ব্যবস্থা আছে। কিন্তু আমাদের এই চারজনের পদযুগল ভরসা।

কলকাতার শিবুদার প্রেরণা আমি। তাঁর ভাষায়, "একটা মেয়ে মানুষ, তার চোখের সামনে দিয়ে হিমালয়ের শৃঙ্গে যাচ্ছে,আর তিনি পারছেন না; তা কি হয়?" আমিও পারছিলাম না, তারপরও অনেক কষ্টে একরকম কাঁদতে কাঁদতে হাঁটছিলাম। পা সাথে আছে কীনা বুঝতে পারছিলাম না মাঝেমাঝেই। গৌরীকুণ্ড থেকে ৭ কিলোমিটার যাওয়ার পর রামওয়াড়াতে যাত্রা বিরতি করলাম। সেখানে অসংখ্য ভেড়ার দেখা মেললো। ভেড়ার আধিক্যের কারণে নাকি এ জায়গার এরূপ নামকরণ। ছোট্ট পাহাড়ি টঙ-এ চা খেলাম শরীরের তাপমাত্রা কিছুটা বাড়ানোর আশায়। দলনেতা আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন। তিনি জানতেন পাহাড়ে একই গতিতে হাঁটতে হয়। থেমে গেলে স্থিতি জড়তার কারণে চলার গতি স্লথ হয়ে যায়। এত উচ্চতায় অক্সিজেন কম তাই নি:শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল। বুকের ভিতরে প্রচণ্ড চাপ অনুভব করছিলাম।

রাস্তার দু'পাশে গভীর খাদ। হিমালয়ের সাদা বরফে সোনা রং-এর রোদের তীব্র ছটায় মনে হয়, যেন পাহাড়ে আগুন ধরে গেছে। খালি চোখে তাকানো যায় না। রোদ চশমায় তাকিয়ে দেখছিলাম বরফে সূর্যের তীব্র আলোর প্রতিফলন। অসাধারণ অপার্থিব। প্রতিমুহূর্তে বিমোহিত হয়েছি। পথের নৈসর্গিক দৃশ্য, মন্দাকিনীর সবুজ সুন্দর প্রবাহ, অসংখ্য ঝরনা - পাহাড়ের গা বেয়ে পাথর চিরে ছুটে যাচ্ছে প্রচণ্ড বেগে কোথাওবা ঝিরঝির হয়ে। কেদারশৃঙ্গের বরফের রুপালি ঝলক, পথের সমস্ত কষ্ট দূর করে দেয়।

অবাক বিস্ময়ে দেখছিলাম, সাদা বরফের শৃঙ্গ হিমালয় - শৈবতীর্থ কেদারনাথ।

কেদার থেকে ফিরে গেলাম হৃষীকেশ। হরিদ্বার থেকে ২৪ কি.মি. দূরে বিখ্যাত আর এক পৌরাণিক শহর। ত্রিবেণী সঙ্গম আর প্রকৃতির শান্ত,নির্জন বনচ্ছায়া, ঋষি, মুনি, পর্যটক কুলকে মুগ্ধ করেছে চিরকাল ধরে। ত্রিবেণী সঙ্গমের কাছে শৈলশহর মুসৌরী আর উত্তরাঞ্চলের রাজধানী দেরাদুন। সন্ধ্যায় গেলাম শহর থেকে ৮ কি.মি. দূরে দক্ষিণ এশিয়ার বিখ্যাত ফরেষ্ট রিসার্চ ইনষ্টিটিউটে। ইন্দিরা গান্ধী আর রাজীব গান্ধীর বিখ্যাত দুন স্কুল কাছেই। শিখদের সাঁইবাবার দরবারে সুরের ঝংকার, চোখ বন্ধ করলে আজও কানে বাজে।

সারা রাতের বাস যাত্রা শেষে হিমাচল প্রদেশের রাজধানী সিমলায়। ব্রিটিশ যুগে গড়ে ওঠা শহর। সিমলা থেকে কালকা, পাহাড়ের ১৪০ টি সুড়ঙ্গ কেটে রেলপথ। গ্রীনভ্যালি, কুফরি, ফাগু, হেলিপ্যাড আর বিখ্যাত এ্যাসেম্বলি ভবন যেখানে ১৯৭২-এ পাকিস্তান ও ভারতের সিমলা চুক্তি হয়েছিল। কালকার খুব কাছেই হরিয়ানা আর পাঞ্জাবের রাজধানী চণ্ডিগড়। পৌরাণিক কুরুক্ষেত্র খ্যাত হরিয়ানায় মোঘলদের শিল্প সৌকর্যের পিঞ্জর গার্ডেন।

ঘোড়ায় চড়ে কুফরির পাহাড়ের শৃঙ্গে পৌঁছে আপেল গাছের নীচে বসে রেস্টুরেন্টে টমেটোর স্যুপ খেতে খেতে হঠাৎই চোখে পড়লো অর্ধবৃত্তাকার হিমালয়ের তুষারের রূপালি শৃঙ্গমালা - অপার্থিব সৌন্দর্য, চারপাশে যেন মালার মতো ঘিরে রেখেছে - সিমলাকে।

জীবন কী আশ্চর্য সুন্দর! চারপাশের শ্বেত শুভ্র তুষার, নীচে সবুজ পাইনের উপত্যকা, উপরে গাঢ় নীল আকাশ - চারপাশে আশ্চর্য আলো, হাত ধরে সূর্যের পাশে দাঁড়িয়ে আছি তারপরেও মনে হয়, কোথাও কেউ নেই। এত অসহ্য সৌন্দর্যের কাছে নিজেকে খুব রিক্ত মনে হয়।

সেদিন ছিল আমার জন্মদিন।
হঠাৎ মনে হলো, এতগুলো বছরে নিজের অর্জন কী ? "কিছুই না"!

ফিরে এসে তোমাকে পেলাম - আমার জীবনের ভোর।
মাতৃত্বের অনুভূতি তো সকলেরই শাশ্বত।

[কেদারনাথের তথ্য]

লেখিকা ও পরিবেশবিদ মার্জিয়া বাংলাদেশের জাতীয় স্তরে পরিবেশ পরামর্শক হিসেবে প্রধানমন্ত্রীর অফিসে কর্মরত। কাজের সূত্রে এবং ভালোলাগার অনুভূতি নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছেন বাংলাদেশের আনাচেকানাচে এবং ভারতের নানান জায়গায়। প্রকৃতি, মানুষ, সমাজ নিয়ে সেই অনুভূতির ছোঁয়াই ফুটে উঠেছে তাঁর কলমে। প্রকাশিত বই 'আমার মেয়েঃ আত্মজার সাথে কথোপকথন'।

কেমন লাগল : - select -

মত দিয়েছেন :

গড় : 0.00

Like Be the first of your friends to like this.

tell a Friend

আপনার মন্তব্য জানাতে ক্লিক করুন

To view this site correctly, please click here to download the Bangla Font and copy it to your c:\windows\Fonts directory.

For any queries/complaints, please contact admin@amaderchhuti.com
© 2011 - AmaderChhuti.com • Web Design: Madhuwanti Basu
Best viewed in FF or IE at a resolution of 1024x768 or higher

কাশ্মীর - পঞ্চাশ বছর আগে

ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়

~ কাশ্মীরের তথ্য ~ কাশ্মীরের আরও ছবি ~

আমার এই লেখাটাকে ভ্রমণ কাহিনি বলা যাবেনা, বলা সঙ্গতও নয়। নিজের কিছু ঘোরাঘুরি ও সেই সূত্রে সেই সময়কে ফিরে দেখার চেষ্টায় স্মৃতি হাতড়ানো। আসলে আমি যখন ঘুরেছি, লেখার জন্য প্রস্তুতি নিয়েতো ঘুরিনি। তখনতো কারো কল্পনাতেও ছিল না যে ফেসবুক নামক বিচিত্র এক জগত সামনে আসবে আর দময়ন্তীর মত কোন উদ্যোগী মানুষ আমাদের সেইসব স্মৃতি ধরে রাখবে তার পত্রিকায়!

রেলগাড়ির নেশা তরুণ মনে কতটা জায়গা দখল করে থাকে তার বিস্তর নমুনা সকলেই জানি। ১৯৬৪র শেষের দিকে রেলের চাকরি পেলাম এখনকার ছত্তিশগড়ের বিলাসপুরে। রেলের চাকরি মানে বিনা টিকিটে রেলগাড়ি চড়বো, রেল পাস দেবে ভারতের যেকোন প্রান্তে রেলে চড়ে যাবার। এর চেয়ে খুশি আর কী হবে তখন তেইশ বছর বয়সী আমার! নতুন চাকরি, পাঁচবছর পর্যন্ত বছরে একটাই পাস থার্ড ক্লাসের। তা হোক একটা পাশই যেন স্বর্গ। পাশগুলো নিতাম দূরের, বিনা পয়সায় রেলে চড়ার ছাড়পত্র যখন আছে তখন কাছাকাছি যায়গার পাশ নিয়ে সুযোগের অপচয় করবো কেন? একত্রিশ বছর বিলাসপুরে কাটিয়েছি। আর সেইজন্য এই বাংলায় দার্জিলিং ছাড়া কোথাও ঘোরা হয় নি।

১৯৬৬-র এপ্রিলে প্রথম রেলে চেপে দূর যাত্রা। তখন তেইশ বছরের তরুণ, দেড় বছর আগে চাকরিতে ঢুকেছি। আমার চেয়ে সিনিয়ার এক সহকর্মীর ফ্যামিলির সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম কাশ্মীর যাত্রায়। প্রথম ঘোরা, সুতরাং শুরু করলাম কাশ্মীর দিয়ে। 'স্বর্গ'তো একটা কাল্পনিক গন্তব্য কারো কারো, সেটাতো তখন ১১০ টাকা মাইনের আমার কপালে থাকার কথা নয় আর সেখানে যাওয়ার কায়দা-কানুনও আমার জানা ছিল না। অতএব ভূস্বর্গ দিয়েই শুরু করা যাক। তখন তরুণ বয়সে কাশ্মীর সম্পর্কে সামান্যই জানতাম। শুধু জানতাম কাশ্মীরকে ভূ-স্বর্গ বলে, আর জানতাম মুঘল বাদশাহ প্রেমিক ও শিল্পী জাহাঙ্গীরের খুব প্রিয় স্থান ছিল কাশ্মীর। কাশ্মীর উপত্যকা প্রকৃতির এক অপরূপ অবদান, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সবটুই যেন উজাড় করে ছড়িয়ে দিয়েছে ১৩৫ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যে আর ৩২ কিলোমিটার প্রস্থের কাশ্মীর উপত্যকায়। আমার কাছে কোন স্থানে ভ্রমণ বা সেখানকার মাটিতে পা দেওয়ার অর্থ ইতিহাসকে স্পর্শ করা, সেখানকার মানুষজনকে জানা এটাই আমাদের পর্যটনের তৃপ্তি!

দ্বাদশ শতাব্দীতে লেখা কলহণ-এর 'রাজতরঙ্গিনী' গ্রন্থে কাশ্মীর রাজ্যের ইতিহাস লেখা আছে । কলহণ লিখেছিলেন 'মহামুনি কাশ্যপ তাঁর গৌরবের জন্যই যেন এই রাজ্যের নির্মাণ করেছিলেন। গৈরিক তুষার, আঙ্গুরের গুচ্ছ যা স্বর্গেও অলভ্য, তা এখানে অজস্র। স্বর্গ-মর্ত-পাতালের শ্রেষ্ঠ স্থান হ'ল কৈলাশ, কৈলাশের সেরা স্থান হিমালয় আর হিমালয়ের শ্রেষ্ঠ স্থান হ'ল কাশ্মীর'। লোককথা অনুযায়ী 'কাশ্মীর' শব্দটির অর্থ 'জলভূমি থেকে শুকিয়ে হওয়া স্থলভূমি' (সংস্কৃত অর্থ কা = জল+শিমীরা=শুষ্কীকৃত)। কলহণ সেই পৌরাণিক বিশ্বাসই লিখেছিলেন 'রাজতরঙ্গিনী'তে । পুরাণ কথা অনুযায়ী, পূর্বে কাশ্মীর উপত্যকা ছিল একটা লেক। মহামুণি কাশ্যপ বরাহমূলা পাহাড় কেটে সেই লেকের জল নিষ্কাষণ করে দিয়েছিলেন ওই অঞ্চলে ব্রাহ্মণদের বসতি স্থাপনের জন্য। পুরাণের কথা থাক, ইতিহাসের কথায় ফেরা যাক। চতুর্দশ শতক পর্যন্ত কাশ্মীর ছিল হিন্দু শাসিত রাজ্য। ষোড়শ শতকে বাদশা আকবর কাশ্মীরকে তাঁর মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। মুঘল যুগেই পঞ্জাব কেশরী রঞ্জিত সিংহের সময়ে কাশ্মীরের ওপর শিখ দখল কায়েম হয়। ১৮৪৫এ ব্রিটিশ কাশ্মীর দখল করে, শিখ শক্তিকে পরাস্ত করে। ইংরাজরা কাশ্মীরকে গুলাব সিংহ ডোগরাকে বিক্রি করে দেয় তাদের অধীনে থাকার শর্তে। ১৯৪৭ পর্যন্ত চলে ডোগরাদের শাসন। তারপর স্বাধীনতা, দেশ ভাগ আর কাশ্মীর বিরোধের সূত্রপাত, বিচ্ছিন্নতাবাদের মাথা চাড়া দেওয়া।

১৯৪৮-এ কাশ্মীর ভারতের অন্তর্গত হওয়ায় পাকিস্তানের সঙ্গে বিরোধের সৃষ্টি। শেখ আবদুল্লা কাশ্মীরের ভারত ভুক্তির বিরোধী ছিলেন, জেলে বন্দী ছিলেন, এই সব কথা আমি জানতাম। পরে একাত্তর থেকেই বোধহয় সীমান্ত নিয়ে বিরোধ, কাশ্মীরীদের স্বায়ত্ত শাসন, গণভোট, বিচ্ছিন্নতাবাদ ইত্যাদি নানা গণ্ডগোল শুরু হওয়ায় সাধারণ ভ্রমণার্থীর কাশ্মীর যাওয়া বন্ধই হয়ে গিয়েছিল দীর্ঘ দিন। সেই সময় ভাবতাম ভাগ্যিস ওইসময় ঘুরে এসেছিলাম! তখন আমাদের কাছে কাশ্মীর আর পাঁচটা জায়গার মতই মনে হয়েছিল, রাস্তাঘাটে সেনাবাহিনীর চোখে পড়ার মত টহল ছিল না, বিরোধটা ছিল রাজনৈতিক স্তরে। আসলে ভেতরের আগুণ আমরা বুঝবো কী করে! তখন কাশ্মীরের ভারতভুক্তির বিশ বছরও পার হয়নি। পাঞ্জাবেও অশান্তির কোন লক্ষণ ছিল না।

রেলের পাস নিলাম পাঠানকোট পর্যন্ত। অর্থাৎ যতদূর পর্যন্ত রেললাইন পাতা হয়েছে। তখন জম্মু তাওয়াই পর্যন্ত রেললাইন হয় নি। শ্রীনগর যেতে হ'ত পাঠানকোট থেকে বাসে। শুধু জম্মু কেন, হিমাচল প্রদেশের ডালহৌসি, কাংড়া এইসব স্থানে পাঠানকোট হয়েই যেতে হতো। দেশ ভাগের আগে একটা ছোট স্টেশন ছিলো এখনকার পাকিস্তানের শিয়ালকোট পর্যন্ত। দেশ ভাগের পর সেটা বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু দেশের অন্যপ্রান্ত থেকে কাশ্মীর যাওয়ার জন্য রেললাইন পাতা শুরু হয় অনেক পরে ১৯৭১-এ আর পাঠানকোট স্টেশন চালু হয় ১৯৭৫-এ। সুতরাং সেই সময় শ্রীনগর যেতে পাঠানকোট থেকে বাসে যাওয়া ছাড়া উপায় ছিল না।

শিয়ালদহ থেকে পাঠানকোট এক্সপ্রেসে চেপে বসলাম। তখন অন্য কোন গাড়ি ছিলনা, একমাত্র গাড়ি পাঠানকোট এক্সপ্রেস। কানাডিয়ান ইঞ্জিন, বিকট আওয়াজে চলতো। তখনও শিয়ালদহ থেকে বর্ধমান বা মুঘলসরাই পর্যন্ত বিদ্যুতায়ন হয়নি। শুধু হাওড়া বর্ধমান ইলেক্ট্রিফিকেশন হয়েছিল। সকাল আটটা নাগাদ পাঠানকোট পৌঁছেছিলাম মনে আছে। আর মনে আছে যে পাঠানকোট থেকে শ্রীনগর যাওয়ার জন্য যে কোম্পানির বাসে আমরা টিকিট কেটেছিলাম

তাতে এন.ডি. রাধাকৃষ্ণ লেখা ছিল। বাসে আর ওদের টিকিট ঘরেও। বাসভাড়া কত ইত্যাদি - আটচল্লিশ বছর আগের কথা আর কিছু মনে নেই । মনে আছে শ্রীনগরে আমরা ছিলাম ঝিলম নদীতে হাউসবোট-এ। ডাল লেকের হাউসবোটে ভাড়া বেশি লাগতো। তবে ডাল লেকে ছোট নৌকায় ঘুরেছি। ওরা বলতো 'শিকারা'। আঠেরো বর্গ কিলোমিটার এলাকা জোড়া ভাসমান অসংখ্য হাউসবোট আর শিকারা, ভাসমান ফুলের বাগান, দোকান আর অপরূপ সৌন্দর্যের 'শালিমার বাগ', 'নিশাত বাগ' ঘেরা ডাল লেক ছাড়া কাশ্মীরকে কল্পনাতেও আনা যায় না। ডাল লেক লাগোয়া শালিমার বাগ ও নিশাত বাগ নির্মিত হয়েছিল মুঘল বাদশাহ জাহাঙ্গিরের উদ্যোগে পত্নী নূরজাহানের প্রতি তাঁর প্রেমের উপহার স্বরূপ। আমির খশরু কেন যে তার শায়রীতে বলেছিলেন 'স্বর্গ যদি কোথাও থাকে সেটা এখানে সেটা এখানে সেটা এখানেই' তা বোঝা যায় এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে সামান্যতম অবগাহন করলেই।

জাহাঙ্গিরকে তাঁর মৃত্যুশয্যায় জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল তাঁর পরম প্রিয় কী? জাহাঙ্গিরের উত্তর ছিল 'কাশ্মীর'।

ডাল লেকে শিকারায় ঘোরা, শিকারাতেই ফল ফুল, সবজির দোকান সাজানো মানুষজনের সঙ্গে অল্পস্বল্প আলাপের সূত্রে জেনেছিলাম ভ্রমণার্থীরাই কাশ্মীর উপত্যকার অর্থনীতির মেরুদন্ড। প্রকৃতির দুহাত উজাড় করা দান ফুল, ফল, কাঠ এইসব বনজ সম্পদ আর মাছ ও অন্যান্য জলজ সম্পদই ওদের ব্যবসা বাণিজ্যের প্রধান উপকরণ। ডাল লেকের ভাসমান হাউসবোট (ঝিলমেও, যদিও সংখ্যায় কম) এক অভিনব ব্যাপার। কাশ্মীর উপত্যকার সংস্কৃতি আর ঐতিহ্যের বাহন এই হাউসবোট। ভারতের কেরালায় বা বিশ্বের অন্যত্র ভ্রমণার্থীদের আকর্ষণ করার জন্য ভাসমান হোটেল আছে হাউসবোট নামে কিন্তু কাশ্মীরের সংস্কৃতি আর মানুষের সঙ্গে যেভাবে জড়িয়ে আছে এখানকার হাউসবোট ব্যাপারটা আর তেমনটি নয় অন্য কোথাও। ইংরাজ কাশ্মীরের দখল নিল, রাজ্য হ'ল, কিন্তু ভূমিপুত্রদের জমি পাওয়ার অধিকার দিল না। হতে পারে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য রক্ষার জন্যই এমন হয়েছিল। তাদের বাসস্থান হ'ল ডাল লেক আর ঝিলম নদীর বুকে ছোট ছোট নৌকা। সেখানেই থাকা, দোকান সাজানো, বিক্রিবাটা করা এইসব। পরে এগুলোই হয়ে গেলো অতি প্রিয় অপরূপ নৈসর্গিক সৌন্দর্য ঘেরা 'হাউসবোট' পোষাকী নামের ভাসমান হোটেল। এখন কেমন জানিনা, তখন ঝিলম নদী অত্যন্ত নোংরা লেগেছিল। শ্রীনগর শহরটাও এতই অপরিচ্ছন্ন ছিল যে দ্বিতীয়বার আর কোনদিন শ্রীনগরে আসার কথা ভাবতেই ইচ্ছা করতো না। তরুণ মনে প্রশ্ন জাগতো তবে সিনেমাতে অত সুন্দর সব দৃশ্য কী করে দেখাতো? অবশ্য সোনমার্গ, গুলমার্গ, শালিমার বাগ, নিশাত বাগ,পহল গাঁও এইসব জায়গাগুলোর মনোরম স্মৃতি এখনো রয়েছে। আর রয়েছে পাঠানকোট থেকে বাসে পাহাড় কাটা আঁকাবাঁকা দীর্ঘ পথে যাওয়ার রোমাঞ্চ। পাঠানকোট থেকে শ্রীনগর যাওয়ার পথে বানিহাল টানেল দেখেছিলাম। দীর্ঘ বানিহাল টানেল দিয়েই বাস গিয়েছিল। ওখানে বাস কিছুক্ষণের জন্য থেমেছিল। আড়াই কিলোমিটার দীর্ঘ টানেল, নাম ছিল জওহর টানেল, নির্মিত হয়েছিল ১৯৫৬তে। বেশ দুর্গম ছিল। কোন রকমে পাশাপাশি দুটি গাড়ি আসা-যাওয়া করতে পারতো। এখন আসা, যাওয়ার জন্য দুটি পৃথক টানেল। তাছাড়া বানিহালে এখন রেলস্টেশনও হয়েছে।

কাশ্মীর উপত্যকায় ভ্রমণের সেরা আকর্ষণ নিশ্চিত ভাবেই শ্রীনগর থেকে ৫২ কিলোমিটার দূরে স্বর্গ শোভার মত তুষার ঘেরা গুলমার্গ। শ্রীনগর থেকে গাড়িতে ঘন্টা দুয়েকের রাস্তা। লোক কথায় শুনেছি স্থানটির আদি নাম ছিল 'গৌরী মার্গ'। শিব পত্নী পার্বতীর আবাস। পাঠান শাসন কালে নামটা পালটে গুলমার্গ রাখেন কোন এক পাঠান শাসক। গুলমার্গ মানে ফুলের পথ। আমি আটচল্লিশ বছর আগে যখন গুলমার্গ গিয়েছিলাম, তখনকার তরুণ মনের সেই অবাক করা বিস্ময় কোন ভাষাতেই বা বর্ণনা করবো? জনমানবহীন শুধু জমাট বাঁধা পাথরের মত সাদা বরফ যেদিকে চোখ দুটোকে মেলা যায়। তখন কোন লোক বসতি বা হোটেল দেখতে পাইনি। দূরে হয়তো ছিল আমি তেমন লোক বসতি দেখিনি। অবশ্য লোকবসতি থাকার কথাও নয়। ২০০১ সালের জনগণনায় দেখেছি গুলমার্গের মোট জনসংখ্যা মাত্র ৬৬৪ জন। এখন গুলমার্গ বিশ্ব পর্যটন মানচিত্রের অন্যতম সেরা স্থান। শ্রীনগর থেকে তিনঘন্টার রাস্তায় সোনমার্গ ভ্রমণার্থীদের আর এক মনোরম আকর্ষণ বিন্দু।

শ্রীনগর পৌছে আমরা যখন হাউসবোটে উঠি থাকার জন্য তখন বোটের মালিক জানতে চেয়েছিল "আপলোগ ক্যা ইন্ডিয়া সে আয়া হায়" - আপনারা কি ভারত থেকে আসছেন? ভীষণ অবাক হয়েছিলাম আর সেই জন্যই এখনো মনে আছে আর থাকবেও চিরদিন। তখন কাশ্মীরের বেতাজ বাদশা শেখ আবদুল্লা জীবিত। পরে তো বুঝেছি কাশ্মীরের বিচ্ছিন্নতাবাদের আগুন-এর উৎসটা ছিল অনেক গভীরে।

প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে ইতিহাস ছোঁয়ার বাসনায় ভূস্বর্গ গিয়েছিলাম। তখন বাঙালির ঘোরাঘুরির পিপাসা আজকের মত এতো তীব্র ছিলনা। এখন নানান প্যাকেজ ট্যুরের বন্দোবস্ত, অসংখ্য ভ্রমণ ব্যবস্থাকারী সংস্থা, অন্তর্জালে নানান তথ্য, কত ভ্রমণ বিষয়ক পত্র-পত্রিকা। ঘরে বসেই আগাম সব আয়োজন করতে পারি, খাওয়া থাকার ব্যবস্থাও পকেটের ওজন অনুযায়ী। পঞ্চাশ বছর আগে এসব কিছুই ছিলনা। তবু কাশ্মীর টেনেছিল কী যেন আকর্ষণে! পঞ্চাশ বছর পরে আজও স্মৃতি হাতড়াই - পকেটে শ'আড়াই টাকা আর একটা রেলের পাস নিয়ে, রেলে চড়ে প্রথম দূরযাত্রার সেই কটা দিন। পঞ্চাশ বছর পরে এখন আর একবার কাশ্মীর যাওয়ার খুব ইচ্ছা। কত কী বদল হয়েছে সময়ের স্রোতে। অশক্ত শরীরে হয়তো যাওয়া হবে না। তবু স্মৃতিটুকু থাক, স্মৃতি সততই সুখের বৈকি!

~ কাশ্মীরের তথ্য ~ কাশ্মীরের আরও ছবি ~

প্রবীণ সাহিত্যকর্মী ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায় সাহিত্য ও সমাজভাবনার নানান বিষয়ে প্রবন্ধ, গল্প ও নাটক লেখেন। রেলওয়েতে চাকরির সুবাদে জীবনের বেশির ভাগ সময় কাটিয়েছেন ছত্তিশগড়ে। এখন উত্তরপাড়ার বাসিন্দা। 'অন্যনিষাদ' ও 'গল্পগুচ্ছ' নামে দুটি ওয়েব পত্রিকা সম্পাদনা করেন। ভ্রমণ বিষয়ক লেখায় এটিই তাঁর হাতেখড়ি।

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

কেমন লাগল : - select -

মত দিয়েছেন :

গড় : 0.00

Like Be the first of your friends to like this.

tell a Friend

আপনার মন্তব্য জানাতে ক্লিক করুন

To view this site correctly, please click here to download the Bangla Font and copy it to your c:\windows\Fonts directory.

For any queries/complaints, please contact admin@amaderchhuti.com
© 2011 - AmaderChhuti.com • Web Design: Madhuwanti Basu
Best viewed in FF or IE at a resolution of 1024x768 or higher

রেশম পথের যাত্রী

মঞ্জুশ্রী সিকদার

~ উজবেকিস্তানের তথ্য ~ উজবেকিস্তানের আরও ছবি ~

দীর্ঘ উনপঞ্চাশ বছরের জীবনসঙ্গী চলে যাওয়ার পর মনটা ভীষণ একটা শূণ্যতায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল, ঠিক তখনই আমার ভ্রমণসঙ্গী জুরান সাহার ফোনটা এল। ওরা উজবেকিস্তান যাচ্ছে, আমাকেও দলে পেতে চায়। আমিও যেন দূরে কোথাও যেতে চাইছিলাম...
মধ্য এশিয়ার একটি প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র উজবেকিস্তান। ১৯২৪ থেকে ১৯৫১ সাল পর্যন্ত এটি সোভিয়েত ইউনিয়নের অধীনে ছিল। ১৯৯২ সালে ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র হিসেবে উজবেকিস্তান দেশের জন্ম হয়। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সভ্যতা সংযুক্তকারী বিখ্যাত রেশম পথের ওপরে এর অবস্থান একে ভৌগোলিক এবং ঐতিহাসিক তাৎপর্য দিয়েছে।
একত্রিশে অক্টোবর ষোলো জনের একটা দলে পাড়ি দিলাম দিল্লি হয়ে তাসখন্দের পথে। উজবেকিস্তানের রাজধানী তাসখন্দে পৌঁছে সেখান থেকে অন্তর্দেশীয় বিমানে এলাম উরগেন-এ। উরগেন থেকে গাড়ি চলল খিভার পথে। ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট ইচান কালা কমপ্লেক্স, কালটা মিনার, মহম্মদ আমিন খান মাদ্রাসা, জুম্মা মসজিদ, বোরগাজী খান মাদ্রাসা, ইসলাম খোজা মাদ্রাসা ও মিনার,তাস খাউনি এবং হারেম - এ পথের দ্রষ্টব্যস্থানগুলি দেখতে দেখতে কখন পেরিয়ে গেলাম ৩৫ কিলোমিটার রাস্তা। প্রাচীন কালে খিভার শাসকদের বাসস্থান কুন্যা আর্ক (Kunya Ark) দেখেও বেশ ভালো লাগলো। মুসলিম স্থাপত্যগুলির নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে সবই দেখতে অনেকটা একরকম লাগে। খিভাতে প্রথম অ্যাকাডেমিক অ্যাকাডেমি প্রতিষ্ঠিত হয়। আরবদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এখানে ইসলাম ধর্মের অনুপ্রবেশ ঘটে। বর্তমানে এই দেশে ইসলামই প্রধান ধর্ম। বিখ্যাত ঐতিহাসিক আলবেরুণী উজবেকিস্তানের মানুষ ছিলেন। মঙ্গোলিয়া থেকে এসে চেঙ্গিস খানও এখানে কিছুকাল রাজত্ব করেছিলেন। পথে যেতে যেতে বেশ কিছু সিমেটারি দেখলাম। এখানকার সিমেটারিগুলো একেকজায়গায় একেকরকম। মাটির নীচে জল থাকায় পাহাড়ের ঢালে সিমেটারিগুলো তৈরি করা হয়েছে।

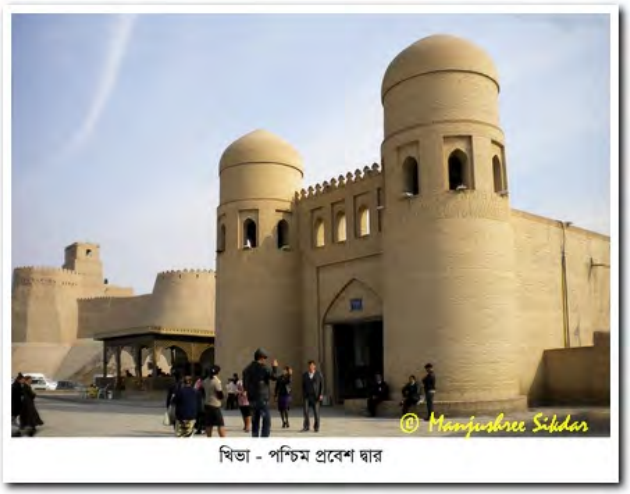

খিভা - পশ্চিম প্রবেশ দ্বার

দোসরা নভেম্বর সকাল বেলা ব্রেকফাস্ট করে আটটা নাগাদ খিভা ছাড়লাম। এবারে কিজিলকুম মরুভূমির ওপর দিয়ে ৫০০ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করতে হবে - ১২ থেকে ১৪ ঘন্টার সফর। উজবেকিস্তানের উত্তরের নিম্নভূমি আসলে এক বিশাল মরুভূমি যা দক্ষিণ কাজাকিস্তানেও প্রসারিত হয়েছে। বিখ্যাত সিল্ক রুট ধরে পার হচ্ছি এই মরুভূমি। সমতল নয়, বেশ উঁচুনীচু। ধূ ধূ বালিও নয়, মাঝে মাঝে কাঁটাগাছ। প্রাচীনকালে এই পথ দিয়ে চলত উটের ক্যারাভান। এই ক্যারাভানেই চলতো রেশম পরিবহন। এসব কথা মনে হতেই দিনের বেলায় এই মরুপথ পেরোনোর রোমাঞ্চ অনুভব করছি। পথে পড়লো আমুদরিয়া নদী। ২৫৮০ কিলোমিটার দীর্ঘ উজবেকিস্তানের বিখ্যাত নদী এই আমুদরিয়া। নদীর ধারে গাড়ি দাঁড়ালে সঙ্গীরা অনেকেই নীচে নদীর খাতে নেমে গেল। পায়ের ব্যথার জন্য আমি গাড়িতেই রয়ে গেলাম। আমার জন্য একজন বোতলে করে নদীর জল নিয়ে এসেছিলেন। সেই জল স্পর্শ করে দুধের স্বাদ ঘোলে মেটালাম। নদীর ধারে কিছুটা সময় কাটিয়ে আবার চলা শুরু হল। যেতে যেতে চোখে পড়ল দূরে মরুভূমির ওপর দিয়ে ট্রেন চলেছে।
উজবেকিস্তানের প্রধান ভাষা উজবেক। চোদ্দ শতাংশ মানুষ রুশ ভাষায় কথা বলেন। এছাড়াও পার্শ্ববর্তী দেশগুলির ভাষাও, যেমন - তুর্কমেন, কাজাক, কিরগিজ প্রভৃতি এখানে প্রচলিত। এখানকার মুদ্রার নাম সোম (Som)। উজবেকিস্তান প্রজাতান্ত্রিক দেশ। এখানে ধর্মেরও কোন গোঁড়ামি নেই। আঠেরো বছরের ছেলেদের জন্য আর্মি সার্ভিসিং বাধ্যতামূলক। সরকার থেকে বিনা খরচে শিশুদের সমস্ত রকম টিকা দেওয়া হয়। পতাকার চারটে রঙ - নীল - পবিত্রতা, সাদা - শক্তি, সবুজ - মা, লাল - রক্ত-এর প্রতীক । বারোটা প্রভিন্স বোঝাতে পতাকায় বারোটি তারা ব্যবহার করা হয়। অর্দ্ধেক চাঁদের অর্থ গ্রোয়িং কান্ট্রি। এদেশের মাটির তলায় নাকি প্রতিবছর ৮০ টন সোনা মেলে। তামা মজুতে বিশ্বের নবম দেশ, ইউরেনিয়ামে একাদশ - গাইডের মুখে এসব বিচিত্র কথা শুনতে শুনতে সন্ধ্যেবেলায় পৌঁছলাম বুখারা শহরে। যে হোটেলে উঠলাম সেটা শহরের একেবারে প্রাণকেন্দ্রে। খুব সুন্দর সাজানো শহর। মরক্কো যেমন মধ্যপ্রাচ্যের প্রাচীন অথচ জীবন্ত শহর, বুখারাও মধ্যএশিয়ার সেরকমই একটি পুরোনো অথচ প্রাণবন্ত শহর। শোনা যায় সংস্কৃত 'বিহারা' শব্দটি থেকে 'বুখারা' শব্দের উৎপত্তি।
তেসরা সকাল ন'টার সময় বেরোলাম ওল্ড বুখারা দেখতে। এখানে এগারোটা গেট আছে। ওল্ড বুখারা ঢোকার মুখে রাস্তার দুদিকের প্রাকার মুসলিম স্থাপত্যের সাক্ষ্য বহন করছে। ষষ্ঠ শতাব্দীতে এই প্রাকার তৈরি হয়েছিল। প্রাকারটির উচ্চতা ১০ মিটার, চওড়া ৮ মিটার এবং ব্যাপ্তি ৩০০ কিলোমিটার। অষ্টম শতাব্দীতে আরবদের আক্রমণে এই প্রাকারের কিছু অংশ ধ্বংস হয়ে যায়। পরে ১৯২০ সালে রেড আর্মিও খানিকটা ধ্বংস করেছিল। প্রথমেই আমরা নামলাম ষষ্ঠদশ শতাব্দীতে তৈরি সিটাডেল আর্ক (Citadel Ark) দেখতে। এটা বুখারার শাসকদের রাজপ্রাসাদ। ২০ মিটার উঁচু একটা পাহাড় বানিয়ে তার ওপর তৈরি হয়েছে এই প্রাসাদ। রেড আর্মির আক্রমণে এই প্রাসাদেরও কিছু অংশ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল। কিছুটা এগিয়ে চশমা আয়ুব মৌসলিয়াম (Chashma Ayub Mausoleum)। এই মৌসলিয়ামকে ঘিরে গল্পকথা রয়েছে। শোনা যায় বুখারাতে জলের অভাব চিরদিনের মত মেটাতে প্রফেট জোভ (আয়ুব) এই মৌসলিয়ামের একটা জায়গা চিহ্নিত করে তাঁর শিষ্যদের বলেন শলাকা গরম করে মাটি খুঁড়তে। মাটির ভেতর থেকে পরিষ্কার সুস্বাদু জল বেরিয়ে আসে। এই জল আজও পবিত্র বলে মনে করা হয়। এরপর দেখলাম বোলো খাউজ মসজিদ (Bolo Khauz Mosque) - এটা বুখারীয় শিল্পশৈলীকে তুলে ধরেছে। ১৭১৪ সালে এই মসজিদটি নির্মাণ করা হয়। কাঠের কাজ করা কুড়িটি স্তম্ভ আছে। বড় গাছ না থাকায় স্তম্ভের কাঠ রাশিয়ার থেকে আনা হয়েছিল। তাকিয়ে দেখি পাশের পুষ্করিণীতে স্তম্ভের প্রতিফলিত ছায়া অপূর্ব সুন্দর দৃশ্যপট রচনা করেছে। প্রত্যেক শুক্রবার ইমাম এখানে আসেন। সামানিড ডাইন্যাস্টির সাক্ষ্য বহন করছে সামানিড মৌসলিয়াম (Samanid Mausoleum)। এর মিনারগুলি খুবই কারুকার্যমণ্ডিত। মিনারটি চেঙ্গিস খাঁ-এর আক্রমণের হাত থেকে

রক্ষা পেয়েছিল। শুনলাম, এটি তৈরি করার সময় নাকি ডিমের সাদা অংশ আর উটের দুধ দিয়ে মাটি মাখা হয়েছিল।

সমরখন্দের উদ্দেশে

পরেরদিন সকাল সকাল বেরিয়ে পড়লাম সমরখন্দের উদ্দেশে। প্রথমেই চলেছি শখরিসবজ (Shakhrisabz) - তৈমুর লঙের জন্মস্থানে। তৈমুরই এখানকার প্রথম জাতীয় নেতা। তাঁর বাবা ছিলেন মঙ্গোলিয়ান মুসলিম, মা স্থানীয় নারী। তৈমুর নিজেকে চেঙ্গিস খাঁ-এর বংশধর হিসেবে দাবী করতেন। তৈমুরের সবচেয়ে বড় আকাঙ্খা ছিল চিন জয় করা। কিন্তু যুদ্ধ করতে গিয়ে পথে অসুস্থ হয়ে ছিয়ানব্বই বছর বয়সে মারা যান। ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাবর ছিলেন তৈমুরের বংশধর। বিখ্যাত সিল্ক রুটটিও তৈমুরের সহায়তায় তৈরি হয়। এখানে পৌঁছে আমরা প্রথমেই দেখলাম একসারায় (Aksaray) শ্বেত প্রাসাদ - তৈমুরের বৈভবের নিদর্শন হিসেবে আজও যা দাঁড়িয়ে রয়েছে। উলুক বেগের তৈরি কোক গুম্বাজ (Kok Gumbaz) বা ব্লু ডোম মসজিদ (Blue Dome)। দেখা শেষে বিকেলে সমরখন্দের হোটেলে পৌঁছলাম।

পাঁচ তারিখ সকালে সমরখন্দ ঘুরতে বেরোলাম। পথে যেতে যেতে গাইডের মুখে শুনলাম, মহান আলেকজান্ডার বিভিন্ন উপজাতির সঙ্গে সমঝোতা করার জন্য সমরখন্দের রাজার মেয়ে রুকসানাকে বিয়ে করেছিলেন। এখান থেকেই আলেকজান্ডার ভারতে আসেন। সিল্করুটের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত সমরখন্দই ছিল প্রাচীনকালে উজবেকিস্তানের রাজধানী। সমস্ত শহর প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। জমি খুবই উর্বর। এখানে প্রচুর সোনাও পাওয়া যায়। সমরখন্দের মূল আকর্ষণ 'রেগিস্তান' নামের এলাকা। যার চারপাশে আছে অনেকগুলি প্রাচীন মাদ্রাসা। এগুলি অবশ্য দোকানেরই নামান্তর। রেগিস্তান স্কোয়ার বাজারে মধ্যযুগীয় শৈল্পিক বিন্যাসের প্রকাশ লক্ষ্য করার মত। প্রচুর গালিচা, সিল্কজাত সুন্দর হাতে কাজ করা জিনিস - যেদিকেই চোখ যায় মন ভরে ওঠে, সেই অনুভূতি লিখে ঠিক বোঝানো যাবে না। ভারত জয় উপলক্ষে তৈমুর যে মসজিদটি নির্মাণ করেছিলেন সেটাও দেখলাম। গুর এমির মৌসলিয়াম (Gur Emir Mausoleum) - তৈমুরের পরিবারের সমাধিক্ষেত্রটির ভিতরটা খুব কাজ করা। উলুক বেগ ছিলেন একাধারে বিজ্ঞানী এবং জ্যোতির্বিদ। মাত্র পনের বছর বয়সে এখানকার প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন। তাঁর অবজারভেটরি এখন মিউজিয়ামে পরিণত হয়েছে।

সমরখন্দ

ছ'তারিখ সমরখন্দ থেকে বেরিয়ে তাসখন্দের পথে চলেছি। আজকের পুরো পথটাই 'বাম-ই-দুনিয়া' অর্থাৎ পৃথিবীর ছাদ পামীর মালভূমির ওপর দিয়ে যাব। ঘন্টাখানেক চলার পর দুদিকেই চোখে পড়ছে ধু ধু কঠিন প্রান্তর। আবার কখনও পাশে সবুজ ক্ষেত। রাস্তার দু'ধারে মাঝে মাঝে আবার লম্বা লম্বা গাছ। এইসব জায়গায় আবার দূরে দূরে দু'একটা বাড়ি। রাস্তার দু'পাশে আপেল গাছ। মধ্যএশিয়ার উজবেকিস্তানে অবস্থিত পামীর রেঞ্জ পৃথিবীর উচ্চতম পর্বতমালাগুলির মধ্যে অন্যতম। এটা প্রধানত সমরখন্দকেই ঘিরে আছে। পামীর পাসের ভিতর দিয়ে পাঁচ ঘন্টার সফর শেষে তাসখন্দে এসে পৌঁছলাম। আজ এখানেই বিশ্রাম।

সাত তারিখ সকালবেলা ন'টা নাগাদ বেরিয়ে পড়লাম ফারঘানা ভ্যালির উদ্দেশ্যে। ফারঘানা যাওয়ার পথে পামীরের সৌন্দর্য একেবারে অন্যরকম। বাঁদিকে প্রায় খাড়া সবুজ পাহাড়। ডানদিকে অনেক দূরে নিরবিচ্ছিন্ন আরেক সারি পাহাড়। দূরের পর্বতমালা বরফের চাদরে ঢাকা। আর মাঝখানে বিস্তীর্ণ সমতলভূমি। হিমালয়, তিয়ানশান, কারাকোরাম, কুনলুন ও হিন্দুকুশ - নামী গিরিমালার সংযোগস্থলে প্রায় ৬০ হাজার বর্গকিলোমিটার অংশ নিয়ে পামীর ছড়িয়ে আছে উজবেকিস্তান, চিন, কিরঘিস্তান, তাজিকিস্তান-এ। টলেমির লেখায় আছে পামীরের ওপরে বাণিজ্যপথের কথা। চিন থেকে অনেক বৌদ্ধও এসেছেন এই পথে।

পামীর হাইওয়ের পোশাকি নাম এম-৪১। পাহাড়ি রাস্তা কিন্তু খুব চওড়া। যেতে যেতে মনে হচ্ছে দূরে প্রকাণ্ড আকাশ যেন নেমে পড়েছে শৃঙ্গের আড়ালে। জনঘনত্ব সামান্য, তাই বসতও ভীষণ কম। পরপর দুটো সুড়ঙ্গ পার হলাম। একটার দৈর্ঘ্য প্রায় পৌনে এক কিলোমিটার। অন্যটা এক কিলোমিটারের চেয়ে সামান্য বেশি। পাহাড়ি ধ্বস আটকানোর জন্য কোথাও কোথাও রাস্তার ধারে মোটাসোটা একগুচ্ছ লোহার গোলাকৃতি স্তম্ভ। এগুলোর উচ্চতা প্রায় পনেরো ফুট। খনিজ সম্পদে পূর্ণ এই পামীর মালভূমি। বিকেলবেলায় কোকন্দ (Kokand) নামে একটা জায়গায় পৌঁছলাম। এটি আগে এই অঞ্চলের রাজধানী ছিল। এখানে খান প্যালেস মিউজিয়াম, ফ্রাইডে মস্ক এবং নরবুট্যাবি (Norbutabiy) মাদ্রাসা দেখলাম। এরপর রিশান নামের এক জায়গায় সেরামিক ফ্যাক্ট্রি দেখলাম। এই ফারঘানা ভ্যালিই বাবরের জন্মস্থান। আগে এখানে পার্সিদের প্রাধান্য ছিল। এখান থেকে বিতাড়িত হয়ে বাবর প্রথমে আফগানিস্তানে আসেন এবং পরবর্তীকালে ভারত জয় করেন। অষ্টাদশ শতকে স্বাধীনতা আন্দোলন করে ফারঘানা স্বাধীন রাষ্ট্রের স্বীকৃতি পেলেও পরে আবার রাশিয়ার দখলে চলে যায়। রাত্রিটা ফারঘানার হোটেলেই কাটানো হল।

তাসখন্দ

আট তারিখ সকালে আবার যাত্রা শুরু রাজধানী শহর তাসখন্দের উদ্দেশ্যে। চলতে চলতে গাড়ি থামলো মার্গিলান (Margilan) শহরে। মধ্য এশিয়ার বৃহত্তম রেশম উৎপাদন কেন্দ্র। এখানে আমরা রেশম কীট থেকে কীভাবে সিল্ক সুতো তৈরি হয় তা প্রত্যক্ষ করলাম। পথ শেষ হল আজকের গন্তব্য তাসখন্দ প্যালেস হোটেলে।

ন' তারিখ সকালে হোটেলে ব্রেকফাষ্ট সেরে বেরিয়ে পড়লাম। প্রথম গন্তব্য ইন্ডিপেন্ডেন্ট স্কোয়ার। উজবেগ প্রেসিডেন্টের উদ্যোগে ১৯৯৮-৯৯ সালে তৈরি পার্কটিতে রয়েছে বিশাল বড় ধাতুর তৈরি একটি মাতৃমূর্তি। গালে হাত দিয়ে চিন্তিত মুখের এই মূর্তিটির সামনে সর্বক্ষণ জ্বলছে অগ্নিশিখা। যুদ্ধে যাওয়া উজবেকদের জন্য দেশমাতৃকার চিন্তার প্রতিমূর্তিস্বরূপ। কাছেই একটি সুদৃশ্য ভবনের বারান্দায় সার দিয়ে রয়েছে ধাতব বই, যার পাতায় পাতায় লেখা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নিহত উজবেক সেনাদের নাম। ষোলটি সুন্দর স্তম্ভের ওপর অসাধারণ ফটক। উচ্চতা তিরিশ ফুটের মতো। উপরে দুটো

উড়ন্ত সারস। পার্কের কোথাও রয়েছে ছোটদের জন্যে খেলার আয়োজন, কোথাওবা জলাশয়ে ভেসে বেড়াচ্ছে রাজহাঁসের পাল। মালবেরি, প্লাটান, পাতাবাহারের ঝাড় – নানারকম গাছ আর ফুলের শোভায় সজ্জিত পার্কটিতে রয়েছে নানা মাপের প্রায় পঞ্চাশটি ফোয়ারা।
তাসখন্দ (Tashkent) মানে পাথুরে শহর। এই শহরের সঙ্গে লালবাহাদুর শাস্ত্রীর স্মৃতি জড়িয়ে আছে। ১৯৬৬ সালের ১১ জানুয়ারি এখানেই লালবাহাদুর শাস্ত্রীর উপস্থিতিতে পাকিস্তানের সঙ্গে শান্তিচুক্তি হয়। আমরা যে হোটেলে ছিলাম, শাস্ত্রীজীও সেই হোটেলেই থাকতেন। এটি এখানকার একটি পুরোনো ঐতিহ্যময় হোটেল। শহরে লালবাহাদুর শাস্ত্রীর একটি আবক্ষ মূর্তি এবং ওনার নামে একটি রাস্তা আছে। চেঙ্গিস খাঁ-এর হাতে ধ্বংস হয়ে যাওয়া শহরটিকে পরবর্তীকালে তৈমুর পুনর্নির্মাণ করলেও আবারও কাঝাক, ইরান এবং মঙ্গোলীয় হানায় বিধ্বস্ত হয়। তবে আজকের সাজানোগোছানো ঝকঝকে শহর, চওড়া রাস্তাঘাট, হকারমুক্ত ফুটপাথ, বহুতল বাড়ি, চোখধাঁধানো শপিং মল এইসব আধুনিক উপকরণ দেখলে ইতিহাসের গল্প অবিশ্বাস্য ঠেকে। কেনাকাটার সবচেয়ে বড় জায়গা চোরসু বাজার। দলের সবাই সেখানে পৌঁছে ভারী উৎসাহিত। বেশ খানিকটা সময় কাটিয়ে তারপর গ্রাণ্ড অপেরা হাউস প্রদক্ষিণ করে ঢুকে পড়লাম হোটেলে।

উজবেকিস্তান সফর এখানেই শেষ। আবার সেই চেনা দুঃখ-সুখে ফিরে আসা...।

তাসখন্দ

~ উজবেকিস্তানের তথ্য ~ উজবেকিস্তানের আরও ছবি ~

ভারত সরকারের মহাগণনিক দপ্তর থেকে অবসর নেওয়া মঞ্জুশ্রীর পায়ের তলায় সর্ষে। সুযোগ পেলেই বেড়িয়ে আসেন এদেশ-ওদেশ। ছয় মহাদেশের মাটিতে পা রাখার পর এখন তাঁর স্বপ্ন আন্টার্টিকা ভ্রমণ।

☆ ☆ ☆ ☆ ☆
কেমন লাগল : - select -
মত দিয়েছেন :
গড় : 0.00

Like Be the first of your friends to like this.

tell a Friend

আপনার মন্তব্য জানাতে ক্লিক করুন

To view this site correctly, please click here to download the Bangla Font and copy it to your c:\windows\Fonts directory.

For any queries/complaints, please contact admin@amaderchhuti.com
© 2011 - AmaderChhuti.com • Web Design: Madhuwanti Basu
Best viewed in FF or IE at a resolution of 1024x768 or higher

বেড়িয়ে এসে আপনার অভিজ্ঞতাগুলো যেমনভাবে শেয়ার করতে চান কাছের মানুষদের সাথে - ঠিক তেমনি করেই সেই কথাগুলো ছোট্ট করে লিখে পাঠিয়ে দিন ছুটির আড্ডায়। ছয় থেকে ছেষট্টি আমরা সবাই এই ছুটির আড্ডার বন্ধু। লেখা ডাকে বা নির্দিষ্ট ফর্মে মেল করে পাঠালেই চলবে। লেখা পাঠাতে কোনরকম অসুবিধা হলে ই-মেল করুন - admin@amaderchhuti.com

বসন্ত উৎসবে শান্তিনিকেতনে

শুভ্রনীল দে

শীত পেরিয়ে বসন্তের উন্মনা হাওয়া আর পথের ধারে আলো হয়ে ফুটে থাকা শিমুল-পলাশ মনে পড়িয়ে দিচ্ছিল গতবছরের দোলের দিনটাকে ...

"ওরে গৃহবাসী, খোল্ দ্বার খোল্, লাগল যে দোল।
স্থলে জলে বনতলে লাগল যে দোল।
দ্বার খোল্, দ্বার খোল্।।"

এই গানের তালে তালে ছাত্র-ছাত্রীদের নাচের ছন্দে ছন্দে প্রতিবারের মত শুরু হয়েছিল শান্তিনিকেতনের বসন্ত উৎসব, ঘড়ির কাঁটায় তখন ঠিক সকাল সাতটা। শুধু দূষণের ভয়ে আশ্রম মাঠের পরিবর্তে পৌষ মেলার মাঠে হয়েছে এই উৎসবের আয়োজন।

১৯০১ সালে পাঁচজন ছাত্রকে নিয়ে শুরু করা শান্তিনিকেতন আজ মহীরূহ হয়ে উঠেছে। বসন্তকে রঙে-রসে, সুরে-নৃত্যে স্বাগত জানানোর এই উৎসবও রবীন্দ্রনাথেরই কল্পনার এক রূপ। আজকে সেই উৎসব বিশাল আকার ধারণ করেছে। বিশ্বভারতীর গণ্ডি ছাড়িয়ে হয়ে উঠেছে সর্বভারতীয় এক উৎসব। দেশ-বিদেশের নানা মানুষের ভিড়ে বর্ণময় হয়ে ওঠে উৎসব প্রাঙ্গণ।

গতবছর মার্চের ২৬ তারিখ রাত ১০.৪৫ নাগাদ হাওড়া-বোলপুর কবিগুরু এক্সপ্রেসে রওনা হয়ে রাত ২.০৫-এ বোলপুরে এসে পৌঁছেছিলাম। হোটেলে ঘন্টা তিনেকের মতন বিশ্রাম নিয়ে ভোর তিনটে নাগাদ হোটেলের সামনে থেকে একটা অটো ধরে চলে এসেছিলাম সোজা উৎসবের মাঠে।

মাঠে পৌঁছে দেখি উৎসব প্রাঙ্গণে নিরাপত্তার কড়াকড়ি অন্যবারের চেয়ে অনেক বেশি। এতে অনুষ্ঠান পরিচালনার সুবিধা হলেও সাধারণ দর্শকদের খুব অসুবিধা হয়। এর আগেও দেখেছি যেমন অনেক জ্ঞানীগুনী মানুষ রঙের উৎসবে শান্তিনিকেতনে আসেন তেমনি প্রচুর সাধারণ মানুষ এখানে সারা রাত জেগে রাস্তার ধারে, ফাঁকা মাঠে পড়ে থাকেন পরদিন ভোরবেলায় অনুষ্ঠান দেখার জন্য।

কবিতো বলেই গেছেন -

"আজ সবার রঙে রঙ মিশাতে হবে।
ওগো আমার প্রিয়, তোমার রঙিন উত্তরীয়
পরো পরো পরো তবে।।"

এখানে মানুষে মানুষে কোন ভেদাভেদ নেই, সবাই সবাইকে আবিরের রঙে রাঙিয়ে দেওয়ার আনন্দে মশগুল।
শান্তিনিকেতনে এসে যেটা চোখে পড়েছিল, নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও অনেক মহিলার মাথায় বা গলাতে পলাশ ফুলের কুঁড়ির মালা। এমনকী বেশ কিছু ভদ্রলোকের গলাতেও মালা রয়েছে! কবিগুরু যখন বসন্তকে আহ্বান করে লিখেছেন -

"নীল দিগন্তে ওই ফুলের আগুন লাগল।
বসন্তে সৌরভের শিখা জাগল।।"

অথবা,

"ওরে ভাই, ফাগুন লেগেছে বনে বনে -
ডালে ডালে ফুলে ফলে পাতায় পাতায় রে,
আড়ালে আড়ালে কোণে কোণে।।"

তখন হয়তো এই পলাশ ফুলের আগুন রঙের কথা স্মরণ করেই লিখেছিলেন। আসলে শুধু বিধি-নিষেধ দিয়েই হবে না, আমাদের নিজেদের এগিয়ে আসতে হবে গাছেদের ভালোবেসে।
একের পর এক গান আর নাচের ছন্দে ঘড়ির কাঁটা ন'টায় পৌঁছালো। "রাঙিয়ে দিয়ে যাও যাও যাওগো এবার যাবার আগে..." - অনুষ্ঠান শেষের গানের সুরে সুরে শুরু হয়ে গেল মাঠজুড়ে আবির খেলা। আকাশে-বাতাসে লাল-নীল-হলুদ-সবুজ-বেগুনীর নানা রঙ উড়ে বেড়াচ্ছে, ছড়িয়ে পড়ছে সকলেরই দেহে-মনে।

"রঙে রঙে রঙিল আকাশ, গানে গানে নিখিল উদাস -
যেন চলচঞ্চল নব পল্লবদল মর্মরে মোর মনে মনে।।
ওরে ভাই, ফাগুন লেগেছে বনে বনে"

আবির খেলার ছবি তুলতে শুরু করলাম। ক্রমে ক্রমে বেলা যত গড়াতে লাগল সূর্যের তাপে ফাঁকা মাঠে গরম অসহ্য হয়ে উঠছিল। উৎসব মাঠ থেকে বেরিয়ে অটো করে একটা হোটেলে পৌঁছে দুপুরের খাবার খেয়ে ফিরে এসেছিলাম বোলপুর প্ল্যাটফর্মে। দেখি ছোট ছোট কয়েকটা বাচ্চা আবির খেলছে। প্ল্যাটফর্মে বেশ কয়েকজন মানুষের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল যাঁদের মধ্যে কেউ কেউ প্রায় ১৫-১৬ বছর ধরে নিয়মিতই এখানে আসছেন বসন্ত উৎসবে। আমিতো মাত্র কয়েকবছরই আসছি। আসলে শান্তিনিকেতনের বসন্ত উৎসবের একটা আলাদা মেজাজ আছে যেটা এখানে না এলে ঠিক অনুভব যায় না।

সন্ধ্যেবেলায় ফেরার ট্রেনে বসে দেহে আর মনে আবিরের রঙ মেখে শান্তিনিকেতনকে বিদায় জানিয়ে ক্লান্ত অথচ আনন্দিত আমি আপনমনেই গুনগুন করে উঠেছিলাম,

"এবার বিদায়বেলার সুর ধরো ধরো ও চাঁপা, ও করবী!
তোমার শেষ ফুলে আজ সাজি ভরো।।
যাবার পথে আকাশতলে মেঘ রাঙা হল চোখের জলে,
ঝরে পাতা ঝরোঝরো।।"

সে সুর যেন এই বসন্তে আজও বাজে, মনোমাঝে ...

~ শান্তিনিকেতনের তথ্য ~

অন্তরের 'যাযাবর' মানুষটিই শুভ্রনীলের প্রকৃত আত্মপরিচয়। ভালবাসেন ক্যামেরার ফ্রেমে ধরে রাখতে ভাল লাগার মুহূর্তগুলো।

☆ ☆ ☆ ☆ ☆
কেমন লাগল : - select -
মত দিয়েছেন :
গড় : 0.00
Like Be the first of your friends to like this.
tell a Friend